Prantik Gabeshana Patrika
Multidisciplinary-Multilingual
Peer Reviewed (Double Blind Referred)
Bi-Annual Research e-Journal

Volume-5 Issue-1 July 2026
International e-ISSN 2583-6706
Website
santiniketansahityapath.org.in

INDEXED IN INTERNET ARCHIVE | GOOGLE SCHOLAR | ORCID | SCRIBD | ACADEMIA

DOI https://doi.org/10.67841/pgp.260501054 OPEN ACCESS

IIFS Impact Factor 3.75 SJIF Impact Factor 3.481

Professor Anisuzzaman's literary mind and outlook on life

অধ্যাপক আনিসুজ্জামানের সাহিত্য মানস ও জীবনদৃষ্টি

S. M. Anwaruzzaman
Associate Professor
Bengali Department
Murari Chand College, Sylhet, Bangladesh

Received on: 25th April 2026
Accepted on: 18th May 2026

Abstract:
Anisuzzaman is a dedicated researcher. His creativity, scholarship and originality in research are well known. Seeing this scholar who is always in the crowd, one cannot understand how deep introspective, skillful analyst and expert in determining themes he is in his private research. Starting from the great Liberation War of the country, he has played a role in every democratic movement with amazing honesty, dedication and wisdom. Therefore, the main purpose of this article is to investigate "Professor Anisuzzaman's literary mind and outlook on life."

Key Words:
Professor Anisuzzaman, literary sensibility, outlook on life, intellectualism, Bengali Muslim, philosophy of life, politics

মূল প্রবন্ধ

ভূমিকা

বাংলাদেশের সৃজনশীল বুদ্ধিবৃত্তিক চিন্তাধারার উজ্জ্বল নক্ষত্র হলেন অধ্যাপক আনিসুজ্জামান (১৮ ফেব্রুআরি ১৯৩৭-১৪ মে ২০২০)। তিনি বাঙালির চেতনার বাতিঘর। আনিসুজ্জামান তাঁর বিপুল কর্ম ও আদর্শে তিনি বাঙালি জীবনের মূর্ত প্রতীক হয়ে উঠেছেন। তাঁর গভীর জীবনদর্শন বোধ বাঙালির সাহসী চেতনায় প্রজ্জ্বলিত ছিল, আছে ও আশা করি থাকবে। তাঁর সুগভীর জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও স্বদেশ চিন্তা বাংলাদেশ ও বাঙালির মাঝে সুবিদিত। বিশ্বব্যাপী বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতিচর্চার প্রসারে তাঁর সাধনা ও কর্মতৎপরতার মূল্য অপরিসীম। এ কারণে আনিসুজ্জামানের শিখরস্পর্শী খ্যাতি স্বদেশের গণ্ডি ছাড়িয়ে বহির্দেশ বা আন্তর্জাতিক অঙ্গনেও সুপরিচিতি লাভে সহায়ক। তিনি বাঙালি জাতিসত্তার ইতিহাস আমাদের সামনে উন্মোচন করেছেন। সহজাত ঔদার্যবোধ থেকে তিনি ভালোবাসেন এদেশকে, এদেশের মানুষকে। ফলে অনিবার্যভাবেই তাঁর চিন্তা ও গবেষণার কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল এদেশের মানুষ। সাহিত্য গবেষণায় বিশেষত বাঙালি মুসলমানের স্বরূপ সন্ধান, পুরনো বাংলা গদ্যের রূপ, সাময়িক পত্রের বিকাশে মুসলমানের অবদান প্রভৃতির স্বরূপ খুঁজেছেন। সমাজ, সাহিত্য, ধর্ম ও রাজনীতির বাঁক পরিবর্তনগুলি তাঁর আত্মজীবনীমূলক রচনায় তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। তিনি আমাদের ইতিহাসের বাঁক বদলের ক্রান্তিকালে আলোর শিখা হাতে হেঁটেছেন। তাই এসব রচনার স্তরে স্তরে জ্ঞানের যে উত্তাপ তা দূর

করে সকল ভ্রান্তি ও প্রান্তিক সীমাবদ্ধতা। তাই তাঁর সাহিত্যকর্মের বিশ্লেষণ ও মননশীলতা সাধারণ পাঠক, চিন্তাশীল বা বুদ্ধিবৃত্তিক পাঠক, আগ্রহী গবেষকদের জন্য এ গবেষণার তথ্য ও তত্ত্ব প্রভূত উপকারে আসবে বিধায় গবেষণাকর্মটির যথেষ্ট উপযোগিতা রয়েছে। আনিসুজ্জামান একনিষ্ঠ গবেষক। গবেষণায় তাঁর সৃজনশীলতা, পাণ্ডিত্য ও মৌলিকত্ব সর্বজনবিদিত। জনতার কাতারে মিশে যাওয়া এই মনীষীকে সবসময় দেখে বোঝা যায় না নিভৃত গবেষণায় তিনি কত গভীর অন্তর্গামী, নিপুণ বিশ্লেষক, প্রতিপাদ্য নির্ধারণে দক্ষ। দেশের মহান মুক্তিযুদ্ধ থেকে শুরু করে প্রতিটি গণতান্ত্রিক আন্দোলনে তিনি বিস্ময়কর সততা, নিষ্ঠা ও প্রজ্ঞার সঙ্গে ভূমিকা রেখেছেন। তিনি জাতির শেকড় অনুসন্ধানের যে সূত্রগুলি আবিষ্কার করেছেন তা অন্বেষণের জন্য এ গবেষণার উপযোগিতা আছে। তাছাড়া আনিসুজ্জামানের চিন্তা শুধু বুদ্ধিবৃত্তিক ছিল না এর সামাজিক উপযোগিতাও ছিল প্রবল। তাই 'অধ্যাপক আনিসুজ্জামানের সাহিত্যে মানস ও জীবনদৃষ্টি' অনুসন্ধানই এ প্রবন্ধের মূল উদ্দেশ্য।

২

সত্য-জ্ঞান-নীতির সাধক[১] আনিসুজ্জামানের শৈশব মানে জীবনের প্রথম দশ বছর অতিবাহিত করেন অখণ্ডিত ভারতের কলকাতার মাটিতে। আনিসুজ্জামানের পরিবার ছিল শিক্ষাবান্ধব পরিবার। পারিবারিক পরিমণ্ডলে তাঁর শিক্ষার শুরু হয়। দেশের ভাঙা-গড়ার কালের প্রাক্-মুহূর্তে তাঁর শিক্ষাজীবন শুরু হয়। বাঙালি-সত্তা সন্ধানী আনিসুজ্জামান ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দে মায়ের 'হাতেম তাই' বইয়ের প্রকাশক হিসেবে আর্বিভূত হন। আহসান হাবীবের সচিব বা সহকারি হিসেবে যুক্ত হন ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে। পরবর্তীকালে জ্ঞান সাধক হিসেবে ১৯৫৯ খ্রিস্টাব্দে ১৯ জানুআরি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে অস্থায়ী প্রভাষক পদে যোগদানের মাধ্যমে কর্মজীবন শুরু হয়। এ পর্বের নিয়োগের মেয়াদ শেষ হয় ১৯৫৯ সালের এপ্রিল মাসে। আবার এবছরের অক্টোবরে পুনরায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অস্থায়ী শিক্ষক হিসেবে যোগ দেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে স্থায়ী প্রভাষক পদে নিয়োগ লাভ করেন, ২৮ ডিসেম্বর ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দে। সিনিয়র প্রভাষক পদে, ১৯৬৪-৬৮খ্রিস্টাব্দে। রিডার পদে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান, ৩ জুন ১৯৬৯। এ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক হিসেবে উন্নীত, ১৯৭২ সালে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে অধ্যাপক পদে যোগদান, ১৯ অগস্ট ১৯৮৫। আবুল কালাম ইনস্টিটিউড ও প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিজিটিং ফেলো হন ১৯৯৪ খ্রিস্টাব্দে। নর্থ ক্যারোলাইনা স্টেট ইউনিভার্সিটি ভিজিটিং ফেলো। বাংলা একাডেমির সভাপতি পদে নিয়োজিত, ১৯ অগস্ট ১৯৯৯-৩১ জানুআরি ২০০২। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে অবসরগ্রহণ, ৩০ জুন ২০০৩। সংখ্যাতিরিক্ত অধ্যাপক পদে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়োগ লাভ, ২০ এপ্রিল ২০০৫। এমেরিটাস অধ্যাপক হিসেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেন ২৩ জুন ২০০৮। বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিজিটিং প্রফেসর, ২০০৮-০৯। বাংলা একাডেমির সভাপতি পদে দ্বিতীয়বারের জন্য নিয়োজিত, ২৯ জানুআরি ২০১২-২৯ জুন ২০২০। জাতীয় অধ্যাপক পদে নিয়োগ পান ১৯ জুন ২০১৯খ্রিস্টাব্দে।

৩

আনিসুজ্জামান তরুণ বয়সে রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হন। সব কিছুর একটা পটভূমি থাকে; থাকে শুরুর পর্ব। আনিসুজ্জামান পারিবারিক ভাবেই সেই সাহিত্যিক ও গবেষক পরিবেশ পান। সাহিত্যক হিসেবেই মন-মনন গড়ে উঠে তাই একাদশ শ্রেণির ছাত্র থাকাকালীন থেকেই সাহিত্য চর্চা শুরু করেন; যাঁর প্রমাণ তাঁর আত্মজীবনী গ্রন্থে পাওয়া যায়। তরুণ বয়স থেকেই গল্প-কবিতা-গান ও প্রবন্ধ রচনা করেন। অন্যদিকে তিনি হলেন একজন নিরলস গবেষক ও অনন্য সাধক। তিনি মূলত গবেষক; তবে শুধু গবেষক নন, সাহিত্যিক ও মননশীল গদ্যশিল্পী। তাঁর জীবন যেন সাহিত্যময়। তাঁর গবেষণা শুধু সাহিত্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না, সংস্কৃতি- সভ্যতা নিয়েও অনেক কাজ করেছেন। গবেষণা সম্পর্কে শামসুর রাহমান কবিতায় বলেন, এখনো গভীর রাতে ঘুমন্ত জীবনসঙ্গিনীর পাশে শুয়ে/ অথবা টেবিলে ঝুঁকে থিসিসের ভাবনায় কাটান প্রহর। গবেষক হিসেবে তাঁর খ্যাতি ও সিদ্ধি শিখরস্পর্শী।[২] গবেষণা গ্রন্থ ছাড়াও রয়েছে গল্প, কবিতা, নাটক ও গান এবং শিশুতোষ রচনা।

৪

© Santiniketan Sahityapath

আনিসুজ্জামান বাংলা সাহিত্যের একজন মননশীল লেখক। বিশ-শতকের বাংলা সাহিত্যের এক অবিসংবাদিত পণ্ডিত, গবেষক ও প্রাবন্ধিক হিসেবে একটি নিজস্ব ভুবন সৃষ্টি করেছেন।[৩] তাঁর যাপিত জীবনের প্রভাব সৃষ্টিকর্মে দেখা যায়। কারণ লেখক বা শিল্পী মাত্রই সংবেদনশীল। প্রত্যেক ব্যক্তির একাধিক গুণ থাকে, তাই তার পরিচয়ও হয় একাধিক। তেমনি একই ব্যক্তির জীবনদৃষ্টি হয় একাধিক। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে চারপাশের পরিবেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। বাঙালির জীবনদৃষ্টি অবলোকনের ধারণা উনিশ শতকের আগে ছিল বলে মনে হয় না। বাঙালি মুসলমানের শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে জীবনদৃষ্টির ধারণা তীব্র বা তীক্ষ্ণ হয়েছে। 'জীবনদৃষ্টি বা দৃষ্টিভঙ্গি কথাটার মানে হচ্ছে জীবনকে আমি কিভাবে দেখছি। জীবন সম্পর্কে আমার সিদ্ধান্ত কেমন হওয়া উচিত এ বিষয়ে একটা সুস্পষ্ট অভিমত। আর জীবনকে সুন্দর করার জন্যে যে একটি জিনিসের প্রয়োজন, তা হলো সঠিক জীবনদৃষ্টি।'[৪] আনিসুজ্জামানের জীবনদৃষ্টি তাই যাপিত জীবনের সঙ্গে যুক্ত।

দেশ-কাল, সময়, সমাজ ও রাজনীতির প্রভাব লেখকের জীবনদৃষ্টিতে প্রভাবক হিসেবে কাজ করে। আনিসুজ্জামান তিন রাষ্ট্রীয় সময়দর্শী একজন লেখক। তাছাড়া তিনি দীর্ঘকাল রাষ্ট্রজীবনের[৫] সঙ্গে জড়িত ছিলেন। 'শিল্পীর বৃহত্তম উপাদান হলো জীবন। জীবনকে তিনি যে কেন্দ্র থেকে উপলব্ধি করবেন তাকেই তিনি প্রকাশ করবেন বাইরে।'[৬] বাংলা, বাঙালি, বাঙালি মুসলমান, ভাষা, সংস্কৃতি ও সাহিত্যের সঙ্গে তিনি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সময়ের হাত ধরে ব্যক্তি-জীবনের দর্শন বা দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন হয়। ব্যক্তির কালগত ক্রমিক অভিজ্ঞতার যোগফল, ঘটনাধারার সমষ্টিই জীবন। সে ক্ষেত্রে জীবনদর্শন হচ্ছে তার শুদ্ধ চৈতন্য, ব্যক্তির জীবননিষিক্ত সত্তা।[৭] এ জন্য আলোচ্য লেখকের জীবনদৃষ্টি উপলব্ধির জন্য দেশ-কাল, সময়, সমাজ ও রাজনীতির হাল-চাল বুঝা দরকার। করা দরকার, জীবনের সমান্তরালে দেশ ও সমাজকে পর্যবেক্ষণ।

আনিসুজ্জামান (১৯৩৭-২০২০) জন্মগ্রহণ করেন অবিভক্ত ভারতবর্ষে। শৈশব কাটে কলকাতায়। পড়াশোনা শুরু পারিবারিক পরিসরে।[৮] কর্মজীবন শুরু পূর্বঙ্গের রাজধানী ঢাকায়, তবে বেশি সময় কেটেছে ঢাকা ও চট্টগ্রাম শহরে। কথা চালু আছে তাঁর জীবনের বেশির ভাগ সময় অনুষ্ঠানের সভাপতি হিসেবে কেটেছে। দেশ-কাল, সময়, সমাজ ও রাজনৈতিক পরিবেশের আলোকে আনিসুজ্জামানের জীবনদৃষ্টি উপস্থাপন করা যায়। সময়ের পরিক্রমায় তিনটি পর্বে ভাগ করে আলাচনা করা যেতে পারে।

- ব্রিটিশ পর্ব (১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে — ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে)
- পাকিস্তান পর্ব (১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে — ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দে)
- বাংলাদেশ পর্ব (১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে — ২০২০ খ্রিস্টাব্দে)

- ঢাকা পর্ব (প্রথম ভাগ: ১৯৪৮— ১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দে, দ্বিতীয় ভাগ: ১৯৮৫-২০২০ খ্রিস্টাব্দে)
- চট্টগ্রাম পর্ব (১৯৬৯ — ১৯৮৫ খ্রিস্টাব্দে)

- ব্রিটিশ পর্ব (১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে — ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে)

আনিসুজ্জামান জন্মেছিলেন পরাধীন দেশে কলকাতার মাটিতে, বেড়ে উঠেছেন পরাধীন দেশে। তিনি পারিবারিকভাবেই সাহিত্যিক পরিবেশ পেয়েছেন। তবে শৈশব ছিল ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ।[৯] দিন কেটেছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আবহে কলকাতার পার্ক সার্কাসে। যুদ্ধের আলাপ অন্দরমহলো থেকে টের পান। ১৯৪২ সালে দিন কেটেছে জাপানি বোমাতঙ্কে, দুর্ভিক্ষের দুর্দশা দেখে দেখে। এমন পরিবেশের উল্লেখ করেন কাল নিরবধি- গ্রন্থে —

> **১৯৪২ এর শেষদিকে আবার নতুন করে বোমাতঙ্ক দেখা দিলো।... ১৯৪৩ ও ১৯৪৪এ কয়েকবারই জাপানি উড়োজাহাজ বোমা ফেলে যায়। শহর নিষ্প্রদীপ থাকতো। শত্রুপক্ষের আগমন টের পেলেই সাইরেন বাজতো। সাইরেনের আওয়াজ পেলে ঘরের বাতি নিভিয়ে দিতে হতো অথবা দরজা-জানালা বন্ধ করে আলো যাতে বাইরে না যায়, তার ব্যবস্থা করতে হতো।[১০]**

© Santiniketan Sahityapath

যুদ্ধের ভয়ালতা উপলব্ধির বয়স না হলেও তিনি দেখেছেন দুর্ভিক্ষের ভয়াবহতা, তেতাল্লিশের মন্বন্তর। কিছু বাস্তবে কিছু জয়নুলের ছবিতে। যেখানে মানুষগুলো কঙ্কালসার এবং লাশ নিয়ে শেয়াল-কুকুর ও শকুনের টানাটানি। তাছাড়াও চতুষ্পদ প্রাণীর মতো চলছে, ডাস্টবিনের খাবার খাচ্ছে। বিশ্বযুদ্ধ ও মন্বন্তরের ক্ষত মন থেকে মুছতে না মুছতেই ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার নির্মমতা তাঁকে ব্যথিত করে। বিষাক্ত সাম্প্রদায়িক ও নিষ্ঠুরতার কথা ছবির মতো তুলে ধরেছেন। গোয়ালাকে হত্যার দৃশ্যটি তাঁর হৃদয়ে দাগ কাটে।

> **সন্ধে হতে না হতে খবর পাওয়া গেল, সারা কলকাতায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হয়েছে। এটা গুজব নয়, যেন তা প্রমাণ করতেই পাড়ায় হিন্দুদের দোকানপাট লুঠ হতে শুরু হয়ে গেল।... যারা আগের দিন লুঠপাট করে ক্ষান্ত ছিল, তারা পরের দিন কিছু কিছু বাড়িঘর আক্রমণ করতে শুরু করলো এবং লাঠি, লোহার রড ও ছোরা হাতে নিয়ে উন্মত্তের মতো ছুটোছুটি করতে লাগলো। একটু পরে দেখি, আসেম ভাই গোয়ালাটিকে ধরে এনে গুন্ডাদের হাতে সোপর্দ করে দিলেন।... আর পলায়নপর গোয়ালার পেছন পেছন ছুটে কে যেন লোহার রড দিয়ে তার মাথায় মারলো। তারপর যার হাতে যা ছিল, তা দিয়ে মারতে মারতে এক সময়ে ম্যানহোলের ঢাকনা খুলে তার মধ্যে তার সেই বিশাল রক্তাক্ত দেহ ঢুকিয়ে দিলো।**[১১]

অখণ্ড বাংলার স্নায়ুকেন্দ্র যে ঔপনিবেশিক কলকাতা, তার লোহিত অস্থিমজ্জা নেড়েঘেঁটে আনিসুজ্জামানের জীবনের প্রথম দশ বছর কাটে কলকাতায়।[১২] এই সময়ে অনেক জ্ঞানীগুণী মানুষের সাক্ষাত পান, যা তাঁর জীবন গঠনে সহায়তা করে। তাছাড়াও তিনি মুকুল ফৌজের সঙ্গে যুক্ত হন।

পাকিস্তান পর্ব (১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে — ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দে):

মুক্তিকামী মানুষের আশা পূরণে ব্রিটিশ শাসনের অবসান হলো। অবিভক্ত ভারত ভাগ হয়ে ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট ‘পাকিস্তান’ নামক নতুন রাষ্ট্র সৃষ্টি হলো। দেশবিভাগের বেদনামিশ্রিত আনন্দ সম্পর্কে লেখক বলেন — ‘কলকাতা থেকে আমরা যশোরে গিয়েছিলাম ব্রিটিশ ভারতের এক মহানগর থেকে অন্য শহরে, ফিরে এলাম সার্বভৌম পাকিস্তান থেকে স্বাধীন ভারতে।’[১৩] তারপর তাঁর মায়ের ইচ্ছে ও চাপে জন্মভূমি ত্যাগের প্রস্তুতি শুরু করেন আনিসুজ্জামানেরা। সুন্দর ভবিষ্যতের আশায় ১৫ অক্টোবর ১৯৪৭ সালে খুলনায় পাড়ি জমান,

> **দেশ ত্যাগের ভয়, হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গার আতঙ্কে তাদের সত্য-মিথ্যার আশ্রয় নিতে হয়েছে সেকথা লেখক অবলীলায় বলে গেছেন। খুলনা এসে আনিসুজ্জামানের ছবির মতো শহর ভালো লেগে যায়। উল্লেখ করেন এভাবে — খুলনা শহর তখন ছবির মতো ঝকঝকে তকতকে।... রাস্তায় বিদ্যুতের বাতি আছে গ্যাসের আলো নয়; কিন্তু বিদ্যুতের সরবরাহ তেমন সম্প্রসারিত নয়। নানা জায়গায় পানির কল বসানো আছে-সুপরিসর পার্ক আছে একটা।**[১৪]

তিনি এখানকার রাজনৈতিক পরিস্থিতি অবলোকন করেন। খুলনা এসেও মানুষের মধ্যে দ্বান্দ্বিক চিত্র দেখতে পান, যা নেতা ও রাজনীতির প্রতি বিতৃষ্ণা জন্মায়। খুলনা এসে ১৯৪৮ সালে খুলনা জেলা স্কুলে অষ্টম শ্রেণিতে ভর্তি হন তিনি। এখানেও শিক্ষার্থীদের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতা দেখতে পান।

এবার ঢাকায় ফেরার পালা। আবার নতুন জায়গায় থিতু হবার পালা। ১৯৪৮ সালের ডিসেম্বর মাসে তাঁদের পরিবার স্থায়ীভাবে ঢাকায় চলে আসে।[১৫] ঢাকা আসার পরে প্রিয়নাথ স্কুলে নবম শ্রেণিতে ভর্তি হন। এই স্কুলের শিক্ষকগণ তাঁর মানস গঠনে প্রভাব ফেলে। লেখকের বর্ণনায় সে সময়কার বিদ্যালয়ে পাঠ্যবই সম্পর্কে জানা যায় এবং যা তাঁর জীবনদৃষ্টি সম্প্রসারিত করেছে। ঢাকায় নতুন বন্ধু-বান্ধব জুটে। পাকিস্তান হওয়ার পর থেকেই মুসলিম লীগ সরকারের নানা ধরনের অপশাসন বিধি ও ব্যবস্থা পূর্ববাংলার জনগণকে বিক্ষুব্ধ করে তোলে। বিশেষ করে বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা না করার পুনঃপুনঃ সরকারি ঘোষণা পূর্ববাংলার রাজনৈতিক অঙ্গনকে উত্তপ্ত করে তোলে। সেই সময়ের সকল সরকার বিরোধী ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলন, বিক্ষোভ, মিছিল, ধর্মঘট, ও প্রতিবাদ সভায় তাঁর অংশগ্রহণ প্রত্যক্ষ।[১৬] বাংলা ভাষার রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতির আন্দোলনে আনিসুজ্জামান যুক্ত হন। দেশভাগরে পর ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমেই তিনি কোনো সংগ্রামী কাজে যুক্ত হন। এ আন্দোলন তাঁকে তথা বাঙালিদের বাঙালি জাতীয়তাবোধে গভীরভাবে আন্দোলিত করে। সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা-সংগ্রাম-পরিষদের সদস্য হয়ে ভাষা আন্দোলনের ঢেউ গায়ে লাগান এবং এতে যুক্ত হয়ে গৌরব বোধ করেন। এ

Prantik Gabeshana Patrika

প্রসঙ্গে বলা যায়-ভাষা আন্দোলনের গনগনে আঁচে পরিশুদ্ধ হন বালক বয়সে।[১৭] তিনি একজন প্রগতিশীল তরুণ। পারিবারিক পরিবেশ থেকেই প্রাগ্রসর চিন্তার প্রেরণা পান। এসময় মাতৃভাষার প্রতি প্রগাঢ় ভালোবাসার কারণেই ভাষা আন্দোলনে শরীক হন। এর মাধ্যমেই তিনি প্রথম সংগ্রাম-আন্দোলনে যুক্ত হয়ে পড়েন। 'কাল নিরবধি'তে এর বিবরণ আছে। নিজের ভাষা-আন্দোলনে অংশগ্রহণ নিয়ে বলেন — ভাষা-আন্দোলনের সময়ে আমি কলেজে পড়ি প্রথম বর্ষে। আমার ভূমিকা সামান্য কর্মীর ছিল। নিজেকে গৌরবান্বিত করার ঝোঁক নেই। গৌরব বোধ করি শুধু এই কারণে যে, অনেকের সঙ্গে আমিও এই মহান আন্দোলনে যুক্ত ছিলাম।[১৮] ভাষা-আন্দোলনের সময় প্রথম পুস্তিকা প্রকাশের সঙ্গেও জড়িত ছিলেন। এ আন্দোলনে জনমত তৈরিতে ও টাকা-পয়সা সংগ্রহের কাজ করেন। ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করা সম্পর্কে লেখক বলেন, বিপুল সংখ্যক ছাত্র ১৪৪ ধারা ভাঙতে চাইছিল। তারপর স্থির হয় ১০ জন করে দল গেইট খুলে রাস্তায় আসবেন, পরে যা হবার তাই হবে। তবে আনিসুজ্জামানের উপর দায়িত্ব ছিল যেন ১৪৪ ধারা ভঙ্গ না করেন কারণ তাঁর কাছে যুবলীগ অফিসের চাবি ও এ আন্দোলন সংক্রান্ত সকল ফাইল ছিল। তিনি ছিলেন আন্দোলন অবলোকনকারী। আন্দোলনকারীদের উপর অত্যাচার ও পাল্টা আক্রমণ প্রত্যক্ষ করেন। এ পর্বেই একুশের চেতনায় স্নাত পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সংসদ ও পূর্ব পাকিস্তান শান্তি কমিটির কাজের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন তিনি। ১৯৫৩ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে স্নাতক সম্মানের পাঠ্যক্রমের বিষয়গুলো আনিসুজ্জামানের চিন্তার জগৎ প্রসারিত করে। তিনি বলেন — বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার শিহরণ আমরা অনুভব করতাম ঠিকই। আমাদের সামনে উন্মোচিত হচ্ছে লেখকের জগৎ, ইতিহাসের একেক অধ্যায়। লাইব্রেরিতে বসে নামজাদা সমালোচকের বই পড়ছি-অন্যথায় যা পড়া হতো না। সেইসঙ্গে সেখানে পাচ্ছি পুরোনো সব পত্রিকা-পরিচয়, চতুরঙ্গ, এমনকি সবুজপত্রও।[১৯]

আনিসুজ্জামান ১৯৫৪এ যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন দেখেছেন এবং এ পরিপ্রেক্ষিতে বাঙালি-অবাঙালি দাঙ্গায় শ্রমিকের মৃত্যুর খবর পেয়েছেন। স্বৈরাচারি সরকারের সামরিক শাসন দেখেছেন। দেশের রাজনৈতিক নানা জটিল পরিস্থিতি প্রত্যক্ষ করেছেন। যেমন:

> **বাঙালি-অবাঙালি শ্রমিকদের মধ্যে দাঙ্গায় কয়েক শ শ্রমিকের মৃত্যু হয়। সবার ধারণা হয় যে, যুক্তফ্রন্ট-মন্ত্রিসভাকে দোষী করার জন্যে অবাঙালি শ্রমিকদের উসকে দিয়ে এবং তাদের হাতে অস্ত্র তুলে দিয়ে দাঙ্গা বাধানো হয়েছে … ৯২ক ধারা জারি হয়ে গেছে। বাইরের অন্ধকারের চেয়ে গভীর এক অন্ধকার আমাকে আচ্ছন্ন করলো।**[২০]

বাংলা বিভাগের ছাত্র থাকাকালীন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে শিক্ষক নিয়োগ নিয়ে বিরূপ সমালোচনার প্রতিবাদ করেন। যুক্তফ্রন্টের মন্ত্রিসভা গঠনের পরপরই দেশে সংকট দেখা দেয়, ভুখা মিছিলে গুলি চলে, এসবকিছুই আনিসুজ্জামানকে প্রভাবিত করে। ১৯৫৫ সালে একুশে ফেব্রুআরি উদ্‌যাপনের সরকারি নিষেধাজ্ঞা অমান্য করায় শিক্ষার্থীদের উপর পুলিশের নির্যাতন ও গ্রেফতারে প্রত্যক্ষদর্শী তিনি। এসময় ছাত্ররা আরো বেশি উত্তেজিত হয়। ১৯৫৬-৫৭ সালে পাকিস্তান সাহিত্য সংসদের প্রতিনিধি হয়ে সৃজনশীল অনেক কাজ করেন এবং কাগমারী ও নয়াদিল্লি সম্মেলনে অংশ নেন। এরপর শুরু হয় তুমুল পড়াশোনা, সাহিত্যচর্চা ও গবেষণা। ১৯৫৯সালে খণ্ডকালীন শিক্ষক হিসেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়োগ লাভ করেন। প্রবল আগ্রহ নিয়ে যোগ দিলেন আবার বিচলিতও হলেন। তবু স্বপ্নপূরণ যে অবাস্তব নয় তাও উপলব্ধি করলেন। নিয়োগ লাভের শর্ত মোতাবেক রাজনৈতিক কার্যকলাপের সন্তোষজনক প্রতিবেদন নিয়ে পুলিশি ঝামেলা পোহাতে হয়। কারণ অনেকে পুলিশের বিরূপ প্রতিবেদনের কারণে চাকরি হারিয়েছেন। তার পর আবার প্রতিবাদ সংগ্রামী কাজে যুক্ত হন। ১৯৬১ সালে রবীন্দ্র-জন্মশতবার্ষিক পালনে বাংলা একাডেমি কোনো উদ্‌যোগ না নিলে স্বৈরতান্ত্রিক সরকারের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে তা পালন করেন বাংলা বিভাগ ও প্রগতিশীল মানুষজন।

১৯৬৮ সালে রাজনৈতিক পরিস্থিতি খারাপ হতে থাকে। পূর্ব পাকিস্তান বিচ্ছিন্ন করার ষড়যন্ত্রের আভাস আলোচিত হতে থাকে। এর সঙ্গে জড়িত থাকার কারণে অনেককে গ্রেফতারও করা হয়। ১৯৬৯ সাল বাঙালির জীবনে এরেকটি মাইলফলক। এ সময়ে পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্র সমাজ ১১ দফা ঘোষণা করে। দফাগুলি নিয়ে আন্দোলন শুরু করে। ১৭ জানুআরি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা বিক্ষোভ করে এবং পুলিশ চাত্রদের আক্রমণ করে, লাঠিপেটা করে; যার প্রত্যক্ষদর্শী আনিসুজ্জামান এবং শিক্ষকদের প্রতিবাদের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। তারপর এই সময়েই আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় মুজিবসহ অনেকে জেলখানায় বন্দি। ছাত্রদের আন্দোলন তীব্র হচ্ছে এবং সেনাবাহিনীর গুলিতে ছাত্রসহ অন্যান্য পেশার মানুষ জীবন দিচ্ছে। নিহত হন দশম শ্রেণির ছাত্র মতিউর, আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় অভিযুক্ত সার্জেন্ট জহুরুল হক, ড. শামসুজ্জোহা। তারপরই ঘটল গণ-অভ্যুস্থান। এ আন্দোলন যেন সবাইকে টানছে,

© Santiniketan Sahityapath

এর অভিজ্ঞতাও ছিল আনিসুজ্জামানের। ২ জুন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ থেকে বিমুক্ত হন। নতুন যাত্রা শুরু করেন। এবার চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গো সম্পর্ক স্থাপনের পালা।

চট্টগ্রাম পর্ব:

আনিসুজ্জামান ১৯৬৯ সালের ৩জুন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে রিডার পদে যোগদানের জন্য রওনা হলে পথে দুর্ঘটনায় পতিত হন। দুর্ঘটনার পর হাসপাতালে অনেক আত্মীয়স্বজন দেখতে আসেন। তারপর উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকার বাসায় চলে আসেন। অন্যান্যের মতোই তাঁকে দেখতে আসেন বঙ্গাবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। সুস্থ হয়ে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেন। আবার নতুন জীবন শুরু করেন। এখানে জীবনের সম্পর্ক গভীর হয়। এ যোগদান ছিল চট্টগ্রামবাসীর জন্য আনন্দের। তিনি চট্টগ্রাম শহরের নানা সাংস্কৃতিক ও সাহিত্যিক কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে যান। চট্টগ্রাম শহরের সঙ্গো আনিসুজ্জামানের সম্পর্ক আবুল হাসনাত বলেন — আনিসুজ্জামান চট্টগ্রামের সাংস্কৃতিক ভুবনে অপরিহার্য ব্যক্তিত্বে পরিণত হয়েছেন এবং শিক্ষার্থীদের মধ্যে জ্ঞানের অনল প্রজ্বলনের তৃষ্ণা সঞ্চারিত করার প্রয়াস, তাঁর যুক্তিবাদী হৃদয়, চারিত্রিক মাধুর্য এবং শিক্ষার্থীদের উদারভাবে সাহায্য করার মধ্য দিয়ে জনপ্রিয় শিক্ষক হয়ে উঠছেন। তাঁকে ছাড়া চট্টগ্রামের প্রগতিশীল কোনো সাংস্কৃতিক ও সাহিত্যিক কর্মকাণ্ড প্রায় অসম্ভব।[২১] ১৯৬৯ সালের উত্তাল দিনগুলো ও বাঙালির পরাধীনতার শৃঙ্খল ভাঙার আন্দোলনে তিনি শরিক হয়েছেন। এ সময় আবুল ফজল, এ আর মল্লিকসহ অন্যান্য বুদ্ধিজীবী ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তির সঙ্গো সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক সভা-সমাবেশে উপস্থিত থেকেছেন।[২২] চট্টগ্রামে যোগদান নিয়ে অনেক সহকর্মী সন্দেহের চোখে দেখেন। এ প্রসঙ্গো আনিসুজ্জামান বলেন — কেউ কেউ নাকি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন যে, নতুন বিশ্ববিদ্যালয়ে পূর্ব পাকিস্থান ছাত্র ইউনিয়নের শাখা গঠনের উদ্দেশ্যে কমিউনিস্ট পার্টি আমাকে সেখানে পাঠিয়েছে। ঢাকা তো ছেড়েছিই, এমন কী, চট্টগ্রাম শহর ছেড়ে ওই ঊষর ক্ষেত্রে যাওয়ার জন্যে আমি ব্যস্ত হয়ে উঠলাম।[২৩] সকল সন্দেহ দ্বিধা দূর করে তিনি তাঁর কাজ করে গেছেন। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে নানা কাজে ব্যস্ত থাকতেন এবং এসময়ের নানা ইতিহাস,' ৭০ এর নির্বাচন, সামরিক শাসন ও দেশের জন্য বঙ্গাবন্ধুর কথা সাবলীলভাবে বলেছেন। ১৯৭০ সালের জানুআরি মাসে আনিসুজ্জামান বাংলা একাডেমির উন্মুক্ত মঞ্চের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে সভাপতির ভাষণ দেন যার দ্বারা বৃহত্তর ছাত্রসমাজ উজ্জীবিত হয়েছিল।

১৯৭০ সালের প্রলয়ংকারী ঘূর্ণিঝড় এবং এর ক্ষয়-ক্ষতি দেখেছেন আনিসুজ্জামান। কেন্দ্রীয় সরকার ও নানা সংগঠনের সহযোগিতায় 'নজরুল ইসলাম'কে নিয়ে জাতীয় সেমিনার আয়োজন করেছেন। এ সময়ই নিজে নির্বাচন এর দায়িত্ব পালনের তিক্ত অভিজ্ঞতার অর্জন করেছেন। আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ বিজয় পেয়েছে এ নির্বাচনে। তবু সরকার গঠন নিয়ে নানা শঙ্কা দেখা দিয়েছে বঙ্গাবন্ধু ছয় দফা বাস্তবায়নে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি খারাপ হতে থাকে। স্বাধীনতা ছাড়া বিকল্প আর কোনো পথ নেই। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল সংগঠন, ছাত্র শিক্ষক সবাই বঙ্গাবন্ধুর নেতৃত্ব ও আন্দোলনের প্রতি সমর্থন দেয়। এ বিষয়ে আনিসুজ্জামান উল্লেখ করেন — সন্ধ্যায় দক্ষিণ ক্যাম্পাসে খোলা জায়গায় ছাত্র-শিক্ষক কর্মকর্তা-কর্মচারীর এক সভা অনুষ্ঠিত হলো। ততক্ষণে মার্চের প্রথম সপ্তাহে আন্দোলনের যে-কর্মসূচি দিয়েছেন বঙ্গাবন্ধু, তা আমরা পেয়ে গেছি। বক্তৃতা যা হলো, তাতে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত করায় প্রেসিডেন্টের নিন্দা, বঙ্গাবন্ধুর নেতৃত্বের প্রতি আস্থা এবং আন্দোলনের সঙ্গো একাত্মতা জ্ঞাপন করা হলো।[২৪]

বাংলাদেশ পর্ব:

১ মার্চ থেকেই দেশের সব জায়গায় মিছিল-সমাবেশ চলে। ৭ মার্চ বঙ্গাবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের রেসকোর্সের ভাষণ শোনার জন্য আনিসুজ্জামান-সহ অন্যান্য প্রগতিশীল লোকজন অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করেন। এ উদবেগ শুধু স্বাধীনতার জন্য। অপর দিকে ২৫ মার্চ রাতে বিভিন্ন জায়গার সঙ্গো টেলিফোন যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়ায় তাঁরা সকলে চিন্তিত হয়ে পড়েন এবং বঙ্গাবন্ধুর খোঁজ নেবার চেষ্টা করেন। কারণ অজ্ঞাত কেউ একজন ফোনে জানিয়েছেন ঢাকায় কারফিউ জারি হয়েছে, পাকিস্তানি সেনারা আক্রমণ শুরু করেছে এবং বঙ্গাবন্ধুকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এর জন্য আমাদের চরম মূল্য দিতে হয়েছে। আনিসুজ্জামানের সঙ্গো পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়, তর্ক হয়। তবু তিনি মনোবল হারান নি। 'অপারেশন সার্চ লাইট' এর মাধ্যমে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী বাঙালির উপর নিধনযজ্ঞ চালায়। ২৬ মার্চ যে স্বাধীনতার ঘোষণা দেন বঙ্গাবন্ধু তা ক্যাম্পাসে প্রচারের ব্যবস্হা করেন আনিসুজ্জামান। তিনি উল্লেখ করেন:

© Santiniketan Sahityapath

... রফিকুল আনোয়ার বাসায় আমাকে ফোন করে বলেন একটা জরুরি বার্তা লিখে নিতে। আমি কাগজ-কলম নিয়ে বসি এবং তিনি যেমন বলেন তেমনটি লিখে নিই। এটাই ছিলো বঙ্গাবন্ধুর স্বাধীনতা- ঘোষণা — ভাষ্যটা ছিল ইংরেজিতে। রফিকুল আনোয়ার অনুরোধ করে ছিলেন, আমি যেন এটা ক্যাম্পাসে প্রচার করার ব্যবস্থা করি।[২৫]

২৭ মার্চ আবার স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্র থেকে মেজর জিয়াউর রহমান স্বাধীনতার ঘোষণা দেন এবং এটা শুনে সবাই আনন্দিত হন, প্রেরণা ও আস্হা লাভ করেন যদিও মেজর জিয়াউর রহমান এর রাষ্ট্র প্রধান বলাটা নিয়ে মিশ্র প্রতিক্রিয়া হয়। পরে ২৮ মার্চ আরেকটি ভাষণে তা প্রত্যাহার করেন। এ বিষয়ে আনিমুজ্জামান বলেন — পরে শুনতে পাই যে, সাবেক কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এ কে খান একটা নতুন খসড়া রচনা করে দেন এবং মেজর জিয়া তা বেতারে পাঠ করেন ২৮ মার্চে। এই ভাষণে জিয়া বলেছিলেন যে, তিনি স্বাধীনতা ঘোষণা করছেন বঙ্গাবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষে। এই ঘোষণাটি বেতারে আমি শুনেছিলাম।[২৬] বঙ্গাবন্ধুর প্রকৃত অবস্থা নিয়ে আনিসুজ্জামান খুব চিন্তিত। পাকিস্তানিরা তাঁকে হত্যা করতে পারেন এমন শঙ্কাও অমূলক নয়। আবার যুদ্ধের পরিণতি নিয়েও চিন্তিত হন তিনি। হত্যার খবর নেওয়া যাচ্ছে না। আপনজনেরা কেমন আছে তা নিয়েও সংশয় তৈরি হয়েছে। অপরদিকে কুণ্ডেশ্বরী আশ্রয়কেন্দ্র অনিরাপদ হয়ে যাচ্ছে। কাটিরহাট থেকে ১০ এপ্রিল রামগড়ে চলে আসে আনিসুজ্জামান। এখানে এসে মেজর জিয়ার সঙ্গো হয় এবং বঙ্গাবন্ধুর সম্পর্কে একটা তথ্য পান যে তিনি আটক আছেন। এদিকে ভারতীয় সীমান্ত ফাঁড়ি সাবরুম খুলে দিলে কিছুকিছু লোক ভারতে চলে যায়। অন্যদিকে সরকারে সঙ্গো রাজনৈতিক সমঝতা না থাকায় ভারতীয়রা আমাদের যুদ্ধের উপকরণ দিতে পারছে না। এমন পরিস্থিতিতে তাদের করণীয় নিয়েও উদ্বেগ দেখা যায়। তারপর মুজিবনগরে বাংলাদেশের সরকার গঠন করে। এটা ছিল আনন্দের। এ প্রসঙ্গো আনিসুজ্জামান আমার একাত্তরে বলেন — 'আমাদের সকলের চোখে পানি চলে এলো, মনে এলো বল।'

সরকার গঠনের পর মানুষ নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে সীমান্ত পাড়ি দেবার সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। সেই ভয়াবহ চিত্রের বর্ণনা দেন লেখক এভাবে — স্রোতের মতো লোক আসছে, রামগড় পেরিয়ে চলে যাচ্ছে সাবরুমে, সেখানেও থাকছে না, আশ্রয়ের খোঁজে চলেছে আগরতলার দিকে।... ঢাকা থেকে এবং দেশের অন্য অঞ্চল থেকে এসেও এভাবে যাঁরা পার হয়ে যাচ্ছেন, তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ পরিচিত, বেশির ভাগই অচেনা।[২৭] যুদ্ধের সময় দেশ ত্যাগ করেন আনিসুজ্জামান। যে দেশ ছেড়ে এসেছিলেন আবার সেই দেশেই আশ্রয় গ্রহণ করেন তিনি ও তাঁর পরিবার। ১৯৭১ সালের ২৬ এপ্রিল নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য আগরতলা যান। শরণার্থী জীবন বেছে নেন এবং এক ধরণের গ্লানিবোধ আচ্ছন্ন করে তাঁকে। শরণার্থীদের দেশ ত্যাগের আরেকটি দৃশ্য আনিসুজ্জামানের মনে দাগ কাটে। তা হলো একজন সদ্যজাত সন্তানকে নিয়ে নিরাপত্তার সন্ধানে ছুটে চলার চিত্রকল্পে। তা হলো —

সেই ভিড়ে একটি মেয়েকে দেখেছিলাম - ছবিটা এখনো চোখের সামনে স্পষ্ট ভাসে। শস্তা নীলশাড়ি-পরা তরুণী, চলছে ধীর পদক্ষেপে। তার সঙ্গীরা দ্রুত তাকে পেছনে ফেলে যাচ্ছে, পেছনের দল এসে তার পাশে হাঁটছে কয়েক মুহূর্ত, তারপর তারাও ছাড়িয়ে যাচ্ছে তাকে। আঁচলের তলায় সে দুহাতে ধরে রেখেছে সদ্যোজাত শিশুকে — পথেই সে শিশু জন্মেছে কিনা কে জানে! মেয়েটির ঘাড় ডান দিকে একটু হেলানো। চোখে অশ্রু নেই, শব্দ নেই মুখে। ধীরে ধীরে চলেছে সে নিরাপত্তার সন্ধানে — দুনিয়ায় তার আর যে অভাব থাক, সময়ের অভাব নেই।[২৮]

তারপর আনিসুজ্জামান ১৫ মে সপরিবারে কলকাতা পৌঁছান। তারপর ৩ এপ্রিল গঠিত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ সহায়ক সমিতিতে কাজ শুরু করেন। বিশেষ করে শরণার্থী শিক্ষকদের কাজের সৃষ্টি করা, আর্থিক প্রয়োজনীয়তা পরিমাপ করা এবং শরণার্থী শিক্ষকদের নিজস্ব সমিতি গঠন করা। ২১ মে বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি গঠিত হয় এবং কার্মপন্থা স্থির করা হয়। যেমন: বাংলাদেশের অবস্থা ব্যাখ্যা করে বাংলা ও ইংরেজিতে পুস্তিকা প্রকাশ; এক্সটেনশন লেকচার দেওয়ার ব্যবস্থা; শরণার্থী শিবিরবাসী ছেলেমেয়েদের জন্যে ক্যাম্প স্কুল স্থাপন; আর্কাইভস-গঠন; ভারতের সঙ্গো স্থায়ী কোনো প্রকল্প নেওয়া যায় কিনা, তা দেখা; শিক্ষকদের কর্মসংস্থানের চেষ্টা করা এবং বস্তুগত সাহায্য করা।[২৯]

শিক্ষক সমিতির কাজ ছাড়াও বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকারে সঙ্গো নানা কাজে জড়িত ছিলেন তিনি। বিশেষত অস্থায়ী সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীনের সঙ্গো কাজ করতেন। ভাষণ-বিবৃতি লিখে দিতেন আনিসুজ্জামান। তাজউদ্দীন চেয়েছিলেন আনিসুজ্জামান তাঁর সঙ্গো কাজ করুক কিন্তু শিক্ষক সমিতিকে কথা দিয়ে ফেলায় তা করতে পারেন নি; তবে যখন ডাক পড়তো আনিসুজ্জামান তখনই ওই কাজ করে দিতেন। কথা রক্ষার চেষ্টা তিনি করতেন। তার প্রমাণ তাজউদ্দীনের সঙ্গো প্রথমে কাজে যোগ

© Santiniketan Sahityapath

না দেওয়া। এ জন্য অবশ্য আনিসুজ্জামান পরে আফসোস করেছেন। এমন পরিস্থিতিতেও আনিসুজ্জামান তাঁর কাজ চালিয়ে গেছেন শুধু দেশের জন্যে। তাছাড়া যুব ক্যাম্প ও বিশ্ববিদ্যালয়ে শরণার্থী শিক্ষকদের নাম পাঠাতেন যেন তাদের কোনো কর্মের ব্যবস্থা হয়। তবু এ সংখ্যা বেশি নয়। প্রতিনিয়ত দুর্দশাগ্রস্ত শিক্ষকের সংখ্যা বাড়তেই থাকে। আনিসুজ্জামান বলেন —

> **তার চেয়ে অনেক বেশিসংখ্যক দুর্দশাগ্রস্ত শিক্ষক প্রতিদিনই আসতে থাকেন। কাউকে কাউকে সামান্য যে টাকা হাতে তুলে দেই, তাতে নিজেরই লজ্জা লাগে। শুধু শিক্ষক নন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কেরানি আসে, টাইপিস্ট আসেন।... আমরা পরিকল্পনা বানাই — দুই সরকারের লোকজনকেই ধরাধরি করি। আমাদের নানা রকম পরিকল্পনায় — প্রয়োগিক ও বিদ্যায়তনিক — সাহায্য করতে আসেন অনেকে।**[৩০]

বাংলাদেশের যুদ্ধ পরিস্থিতির কথা আলাপ করেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারে খাদ্য বিভাগের উর্ধ্বতন কর্মকর্তার সঙ্গে এবং তিনি কৌতূহলী হয়ে জানতে চান, বাংলাদেশ কতদিনে স্বাধীন হতে পারে। তার উত্তর এভাবে দেন আনিসুজ্জামান। বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকারের সদর দপ্তরের বর্ণনাও চমৎকারভাবে 'আমার একাত্তর' গ্রন্থে তুলে ধরেছেন। তাজউদ্দীন আহমদের ত্যাগের কথাও বলে গেছেন নির্মোহ দৃষ্টিকোন থেকে। আনিসুজ্জামান ও তাঁর দল দিল্লিতে শরণার্থীশিবিরে স্কুল খোলার ব্যাপারে ভারত সরকারের সঙ্গে আলোচনা করেন। তাছাড়াও ১৭ জুন ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে দেখা করেন। তিনি (ইন্দিরা গান্ধী) খুব ধৈর্যসহকারে তাঁদের কথা শোনেন। এ প্রসঙ্গে লেখক বলেন — ইন্দিরা খুব ধৈর্যের সঙ্গে আমাদের বক্তব্য শোনেন এবং খুব ধীরস্থিরভাবে যতিসমেত তাঁর কথা বলেন। আমরা ভারত সরকারকে ধন্যবাদ দিলাম সীমান্ত খুলে দিয়ে শরণার্থী আসার ও তাদের থাকার ব্যবস্থা করার জন্যে; বাংলাদেশ সরকারকে স্থান দেওয়ার জন্যে; সীমিতভাবে হলেও আমাদের যুদ্ধ-প্রচেষ্টায় সাহায্য করার জন্যে; এবং আমাদের মতো বেসরকারি সংগঠনকে অবাধে প্রচারাভিযান চালাবার সুযোগ দেওয়ার জন্যে।[৩১] তারপরও দেশের স্বাধীনতার জন্য ভারতের স্বীকৃতি প্রয়োজন। সেই স্বীকৃতি দানের জন্যও তাঁর দল চেষ্টা চালিয়ে যান। ভারত স্বীকৃতি না দিলে বাংলাদেশের সরকার শক্তিশালী হচ্ছে না এবং বাইরের দেশগুলোও স্বীকৃতি দানে আগ্রহ দেখাচ্ছে না; এমন আলাপ-আলোচনাও ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে হয়।

জুলাই মাসে বাংলাদেশ সরকারের পরিকল্পনা সেল গঠিত হয়। তাজউদ্দীনের ইচ্ছায় আনিসুজ্জামান এর সদস্য হন। কিন্তু সৈয়দ নজরুল ইসলামের ওই বামঘেঁষা সন্দেহের কারণে তাজউদ্দীনকে অনেক প্রতিবন্ধকতা মোকাবেলা করতে হয়েছিল। আনিসুজ্জামান কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট প্রণয়নের সঙ্গেও জড়িত ছিলেন। শিক্ষা সংক্রান্ত পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য তিনি কিছু প্রস্তাবনা তৈরি করেন এবং বিদেশে বাঙালি যে সব ছাত্রদের বৃত্তি বন্ধ হয়েছিল তাদের পড়াশোনা চালানোর উদ্যোগ নেন। তাছাড়াও দেশে বিধ্বস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পুর্নগঠনে স্থানীয়দের সহযোগিতা এবং পাঠদান কার্যক্রমে স্থানীয় তরুণদের যুক্ত করার প্রস্তাব দেন। শরণার্থী শিক্ষক যাঁরা দেশে যাবেন তাঁদের আংশিক সময়ের বেতন পরিশোধের কথা বলেন। অগস্ট মাসে যখন সামরিক আদালতের মাধ্যমে বঙ্গাবন্ধুর বিচার করে হত্যার চক্রান্ত চলে তখন অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী বেতার এবং সংবাদপত্রে বিবৃতি দিয়ে প্রতিবাদ জানান। বিশ্ববাসীর কাছে বঙ্গাবন্ধুর জীবন রক্ষার জন্য ব্যবস্থা নিতে অনুরোধ জানান। অন্য দিকে বুদ্ধিজীবীগণও বঙ্গাবন্ধুর জীবন বাঁচাতে উদ্যোগ নেন। কলকাতায় বাংলাদেশ বুদ্ধিজীবী মুক্তিসংগ্রাম পরিষদ ও বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির যৌথ উদযোগে ১৩ অগস্ট সকালে বাংলাদেশ মিশনের সামনে বিশাল প্রতিবাদ-সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয় এবং বড় মিছিল বের হয় সেখান থেকে। আমরা পাকিস্তান সরকারকে ধিক্কার দিই, বঙ্গাবন্ধুর মুক্তি দাবি করি এবং বিশ্ববিবেকের কাছে আবেদন জানাই।[৩২] ২০ অক্টোবর আনিসুজ্জামান আগরতলা যান নিজের গাড়ি আনার জন্য। এখানে এসে দেখতে পেলেন আহত মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসা ব্যবস্থা ভালো নয়। তিনি ডাক্তার হিসেবে যোগ দিতে আবুল বশরকে পরামর্শ দিলেন। কিন্তু হাসপাতালের জন্য ডাক্তার প্রয়োজন। তখন আগরতলায় ডা. এ কিউ এম বদরুদ্দোজা চৌধুরীর সঙ্গে দেখা হয় এবং তাঁর পরিকল্পনার কথা জানতে চান আনিসুজ্জামান। অবশেষে ৩১ অক্টোবর গাড়ি নিয়ে কলকাতা পৌঁছান। শরণার্থী জীবনের সংকটে অনেকে চলে গেলেন দেশের বন্দীশালায়। এতে সবার উদ্বেগ বাড়তে থাকলো এবং সরকার বিব্রত হলো। কারণ তারা ফিরে গিয়ে পাকিস্তানীদের পক্ষে কাজ করছে।

আনিসুজ্জামান প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীনের সঙ্গে কাজ করতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রীর জনগণের দুর্ভোগের জন্য তিনি কতটা কষ্ট পান তা আবিষ্কার করেন। মানুষের প্রতি তাঁর (তাজউদ্দীন) কিরকম ভালোবাসা ছিল তাও খেয়াল করেন। সাধারণ জনগণের জন্য তাঁর ভাবাবেগে ছিল অভিভূত হবার মতো। ১৬ ডিসেম্বর দেশ স্বাধীন হলো। আনিসুজ্জামান ফিরে আসবেন আবারও দেশের কাজ করবেন

© Santiniketan Sahityapath

এটাই স্বাভাবিক। তবে ১৯৭১ এর আগে যাঁরা এসেছিলেন তাঁরাও যদি যেতে চান বাংলাদেশে তখন কি হবে? এমন কি বাচ্চু মিয়া নামে একজন ঘোষণা দেন বাংলাদেশে ফিরে যাবো। বাচ্চু মিয়া বলেন — আমি কখনো পাকিস্তান চাইনি, চাইনি কোনো সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্রের নাগরিক হতে। তাই দেশ ছেড়ে চলে এসেছিলাম। এখন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, আমার জন্মভূমি হয়েছে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র। আমি সেখানে ফিরে যাবো — এ আমার জন্মগত অধিকার।[৩৩]

৫ জানুআরি ১৯৭২ সালে আনিসুজ্জামান ও তাঁর পরিবার স্থায়ীভাবে বাংলাদেশে ফিরে আসেন, সে অনুভূতি সম্পর্কে সিদ্দিকা জামান বলেন — উদ্বাস্তু জীবনের সমাপ্তি ঘটিয়ে, আমরা কলকাতা থেকে যশোর দিয়ে দেশে প্রবেশ করলাম। মনে আছে সীমান্ত পার হয়ে গাড়ি একপাশে রেখে আমি আর আনিসুজ্জামান স্বাধীন দেশের মাটি হাতে তুলে নিয়েছিলাম। ঝাপসা চোখে দুধারের বিধ্বস্ত অবস্থাও দেখলাম। পাকিস্তানিদের বানানো পরিত্যক্ত বাঙ্কারগুলিও চোখে পড়ল। যাঁরা জীবন দিয়েছেন তাঁদের কথা ভেবেও মনটা ভারাক্রান্ত হয়েছিল।[৩৪] কতটা মমত্ববোধ থাকলে, দেশের মাটি দুহাত ভরে নেওয়ার এমন অনুভূতি জাগ্রত হতে পারে তা অনুমান করা যেতে পারে। ৮ জানুআরি ১৯৭২ সালে আনিসুজ্জামান ঢাকায় আসেন। প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গো সাক্ষাৎ করেন এবং দেশের নানা সমস্যা নিয়ে আলাপ হয়। ১০ জানুআরি বঙ্গাবন্ধু দেশে ফিরে আসেন এবং তাঁর ভাষণ শুনতে জনসভায় লেখকও যান। বঙ্গাবন্ধুকে অবলোকন করেন। তিনি বলেন, বঙ্গাবন্ধু কিছুটা দুর্বল তবে কণ্ঠের তেজ একটুও কমেনি। বঙ্গাবন্ধুর কিছু কথা উদ্ধৃত করেন, যা ভুট্টোকে উদ্দেশ্য করে বলেন। যেমন, 'কোনো বন্ধন নয় আর পাকিস্তানের সঙ্গো; বাংলাদেশ স্বাধীন — এর রাষ্ট্রীয় নীতি ধর্মনিরপেক্ষতা, গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র।'[৩৫]

চট্টগ্রাম পর্ব:

স্বাধীন দেশের জন্য সংবিধান দরকার। বাংলাদেশেরও সংবিধান প্রণয়ন করতে হবে। সেখানে ডাক পড়ে আনিসুজ্জামানের। ড. কামাল হোসেন তাঁকে খবর পাঠান, সংবিধানের ইংরেজি খসড়া করবেন ড. কামাল আর এর বাংলা করতে হবে আনিসুজ্জামানকে। ড. হোসেন আরও জানান বাংলাটাই শেষ পর্যন্ত প্রামাণ্য হিসেবে গৃহীত হবে। এভাবে বহু ত্যাগের বিনিময়ে রচিত বাংলাদেশের সংবিধান। তিনি তখনই বেশি ব্যথিত হয়েছেন যখন এর মূল নীতিতে বার বার আঘাত এসেছে। সংবিধান প্রণয়নে জনগণের প্রতিশ্রুতির সঙ্গো সঙ্গো বঙ্গাবন্ধু এবং আওয়ামী লীগের চাওয়ার সমন্বয় পরিস্ফুট করার চেষ্টা করেছেন আনিসুজ্জামান ও ড. কামাল। আনিসুজ্জামান নিজেও এমন জীবন দর্শন মানতেন। তবে শাসনতন্ত্র কমিটির অনেকে ১২ অনুচ্ছেদ নিয়ে তর্ক তুলেছিল। তারা ধর্মের সঙ্গো রাজনীতির সম্পর্ক চায় এবং ধর্মীয় রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশকে দেখতে চায়। পরে সিদ্ধান্ত হয় আইনপ্রণয়নের ক্ষেত্রে ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলা হবে।

আনিসুজ্জামান শিক্ষা কমিশনের সদস্য ছাড়াও ছাত্রকল্যাণ ও জাতীয় সেবা-সম্পর্কিত অনুধ্যান কমিটিতে যুক্ত ছিলেন। বঙ্গাবন্ধুর কথা রক্ষার্থেই হোক বা আব্দুর রাজ্জাক স্যারের কথার পরিপ্রেক্ষিতে হোক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য মুজাফফর আহমেদ চৌধুরী আনিসুজ্জামানকে অধ্যাপক পদে নিয়োগের চেষ্টা করেন। কিন্তু বাধ সাধে বেনামি একটি প্রচারপত্র ও সংবাদপত্রের প্রতিবেদন। এর ভাষা ছিল মারাত্মক এবং আক্রমণাত্মক। সম্মানীত লোকজন এতে অপমানিত হচ্ছেন, এ জন্য আনিসুজ্জামান বিচলিত হন এবং বিবৃতি দিয়ে পরিস্থিতি ঠাণ্ডা করতে চান। তাছাড়াও উপাচার্য মহোদয়কে স্বস্তিকর দেখতে চান। এই নিয়োগে অধ্যাপক না হওয়া বা নিজের ইচ্ছায় যোগ না দেওয়া ছিল বড়ো রকমের ত্যাগের উপমা।

আনিসুজ্জামান যে ছিলেন ভ্রমণ পিপাসু তার প্রমাণ তাঁর আত্মজীবনীতে পাওয়া যায়। ১৯৭৩ সালে প্যারিস যান ইন্টারন্যাশনাল কংগ্রেস অফ ওরিয়েন্টালিস্টের দ্বিশতবর্ষপূর্তি অনুষ্ঠানে। একই বছর যান বিশ্বশান্তি-তরঙ্গো যোগ দিতে মস্কোতে। এরপর ম্যাকগিল ইউনিভার্সিটিতে সেমিনারে যান। ১৯৭৪ সালে যান মন্ট্রিয়লে। আনিসুজ্জামানের শিক্ষা চিন্তার প্রতিফলন দেখা যায় শিক্ষা-কমিশনের রিপোর্টে। দেশের আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতির উপর ভিত্তি করে এই রিপোর্ট প্রণয়ন করে কমিশন।[৩৬] এই কমিশন সদ্য স্বাধীন দেশে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও সদ্য রচিত সংবিধানের মৌলিক বিষয় প্রতিফলন করার চেষ্টা করেন। বঙ্গাবন্ধু হত্যার পর নতুন রাজনৈতিক মেরুকরণ শুরু হয়। ইতিমধ্যে সৌদি ও চিন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিল। অন্যদিকে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের অনেককে গ্রেফতার করা হয় এবং চার নেতাকে জেলখানায় হত্যা করা হয়। যাঁদের সঙ্গো কাঁধে কাঁধ রেখে দেশ স্বাধীন করতে কাজ করেছেন; তাঁরা আজ অন্তরীণ। এটা আনিসুজ্জামানের জীবনদৃষ্টিতে প্রভাব ফেলে। তাই পরবর্তী সময়ে আনিসুজ্জামান তাঁর লেখার মধ্যে প্রতিবাদের বিষয়গুলো নিয়ে এসেছেন।

© Santiniketan Sahityapath

মেজর জিয়ার সরকার দায়িত্ব নেন এবং যারা পঁচাত্তরের হত্যা ও ৩ নভেম্বর জেল হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে ব্যাংকক যেতে সহায়তা করেন। আনিসুজ্জামান যে সবসময় নীতিনিষ্ঠ ছিলেন এমন নয়। তিনি নিজেই এ কথা স্বীকার করেছেন দ্বিতীয়বার বাংলা বিভাগের সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করে। আনিসুজ্জামানের নীতির পরিচয়ও উল্লেখ করেছেন ভূতাপেক্ষ জ্যেষ্ঠতা ও মুক্তিযুদ্ধের সময়ের বকেয়া বেতন গ্রহণ না করে। পাশাপাশি আরেকটি নিরপেক্ষতার অভাবের কথা বলেন আনিসুজ্জামান অধ্যাপক পদে আবু হেনা মোস্তফা কামালের নিয়োগ প্রসঙ্গে। ১৯৭৬ সালের মার্চ মাসে টোকিও যান এশিয়ার সাংস্কৃতিক গবেষণা-প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রতিনিধি সভায় যোগ দিতে। এখানে 'বাংলাদেশে সাংস্কৃতিক গবেষণার সমকালীন অবস্থা' সম্পর্কে প্রবন্ধ পাঠ করেন। আনিসুজ্জামান এতো কষ্ট করে কোম্পানির পুরোনো কাগজপত্র নিঃসঙ্গ ধ্যানীর মতো ঘেঁটে নতুন ইতিহাস জানাতে চাইছেন। কিন্তু প্রফেসর স্মিথ তেমন আগ্রহ দেখালেন না। সাহিত্যের ছাত্র হয়ে ইতিহাসের প্রতি এতো টান কেন তার মানে এই প্রফেসর বুঝে উঠতে পারেন নি। এই প্রসঙ্গে মফিদুল হকের মূল্যায়ন বিশেষ গুরুত্ব রাখে। এই কাজ সম্পন্ন করতে আবারও তিনি ১৯৭৯ সালের ১০ মার্চ লন্ডন যান। মোটামুটি তিন দফায় লন্ডন অবস্থান করে পুরাতন চিঠিপত্রের কাজ সমাপ্ত করেন যা পরবর্তীতে ১৯৮১ সালে 'Factory Correspondence and other Bengali Documents in the India office Library and Records' নামে প্রকাশিত হয়। এটি নিয়ে তাঁর এবং অধ্যাপক আবদুর রাজ্জাকের উচ্ছ্বাস ছিল বেশি। এই গ্রন্থটি আনিসুজ্জামানের সেরা কাজের মধ্যে একটি, যা তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন আত্মজীবনীতে।

আনিসুজ্জামানের আবার ব্যথিত হবার পালা। ১৯৭৮ সালে জিয়াউর রহমান রাষ্ট্রপতি হন এবং সামরিক ফরমানবলে সংবিধানে ছুরি চালান। এবার যে পরবির্তনগুলি আনেন তা হলো — 'সংবিধানের সূচনায় সংযোজন করলেন বিসমিল্লাহ, প্রস্তাবনায় মুক্তির জন্য ঐতিহাসিক সংগ্রামের বদলে আনলেন স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ, ধর্মনিরপেক্ষতার জায়গায় আনলেন সর্বশক্তিমান আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস, সমাজতন্ত্রের ব্যাখ্যা করলেন অর্থনৈতিক ও সামাজিক সুবিচার বলে।'[৩৭] মুক্তিযুদ্ধের চেতনা নষ্ট করা হলো, ধর্মনিরপেক্ষতার জায়গায় একটি নির্দিষ্ট ধর্মের প্রতি আস্থার কথা বলা হলো, সমাজতন্ত্রেরও বারোটা বেজে গেল। এ চেয়ে ভয়ঙ্কর রূপ আসে হুসাইন মুহাম্মদ এরশাদ এর সময়ে করা সংবিধান সংশোধনীতে। ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার মাধ্যমে। আনিসুজ্জামান লন্ডন থেকে ফিরে এসে বিভাগের কাজে মনোনিবেশ করেন। তিনি বিদেশ যাওয়ার আগে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে বলেছিলেন বিভাগের সভাপতি পদে আর নিয়োগ না দিতে; কর্তৃপক্ষ সে কথা রেখেছে, আবু হেনা মোস্তফা কামালকে সভাপতি করা হয়েছে। এ চাওয়ারও একটা কারণ ছিল, ১৯৭৫ সালে নিয়মভঙ্গ করে দ্বিতীয়বার সভাপতি হয়েছিলেন; সেটা কিছুটা পোষানোর সুযোগ করে দিলেন আনিসুজ্জামান। তিনি শুধু শিক্ষক হিসেবে রয়ে গেলেন বাংলা বিভাগে। এই সময়ে তাঁর জীবনদৃষ্টির একটা বিষয় খেয়াল করার মতো। তিনি জুনিয়রের নেতৃত্বে বিভাগে কাজ করছেন; এটা বিরল। কেউ প্রশ্ন করলে এ প্রসঙ্গে আরও বলেন — এই যে কর্মে কনিষ্ঠ একজন বিভাগীয় সভাপতির অধীনে আমাকে কাজ করতে হচ্ছে, সেটা আমার কেমন লাগছে? আমি বলি, 'আমার কোনো অসুবিধা হচ্ছে না। আমি যখন সভাপতি ছিলাম, তখন সহকর্মীদের নিজের অধীন বিবেচনা করিনি, এখনো নিজেকে কারো অধীন মনে করছি না। সভাপতি সহকর্মীদের নেতৃত্ব দেন, তার কমবেশি নয়।'[৩৮]

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ: দলিলপত্র প্রকাশ হতে হতে সময়ের পরিবর্তন হয় এবং দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতিও পরিবর্তন হতে থাকে। ১৯৮১ সালে রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান নিহত হন। দেশে আবার জরুরি অবস্থা জারি করা হয়েছে। রাষ্ট্রপতি নির্বাচন হয় এবং জেনারেল হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ প্রকাশ্যেই বিএনপি প্রার্থীকে সমর্থন দেন। এরপর আনিসুজ্জামান ঢাকায় চলে আসেন এবং বোনের মৃত্যু হয়। আনিসুজ্জামানের বিবেকের আরেকটি পরিচয় পাওয়া যায় উপাচার্যের বিরুদ্ধ দুর্নীতির বিচার সামরিক আইনে হওয়া নিয়ে। তিনি এর আপত্তি জানান। এই আইনে বিচার হয় চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক আবদুল করিম, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি মযহারুল ইসলাম ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি আবদুল মতিন চৌধুরীর। এ প্রসঙ্গে আনিসুজ্জামান বলেন — সামরিক আইনে অভিযুক্ত ব্যক্তি আত্মপক্ষসমর্থনের যথাযথ সুযোগ পান না বলে আমার বিশ্বাস। এইভাবে সামরিক আইনে বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ পদাধিকারীর হেনস্থা বিশ্ববিদ্যালয়ের এবং তার শিক্ষকদের ভাবমূর্তি যেভাবে ধ্বংস করছে, আমি তার বিরুদ্ধে।... শুধু বিচার হলেই হয় না, তা যে সুবিচার হয়েছে, তা দৃশ্যমান হওয়া আবশ্যক হয়।[৩৯]

© Santiniketan Sahityapath

১৯৮৩ সালে ঢাকায় ছাত্রহত্যার প্রতিবাদে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা সামরিক আইন অমান্য করে মৌন মিছিল করার সিদ্ধান্ত নেন, তাতে আনিসুজ্জামানও অংশ নেন। এই সালেই জাপানের ৎসুকুবা বিশ্বাবদ্যালয়ে মানবিক মূল্যবোধ শিরোনামে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক সম্মেলনে যোগ দেন। ১৯৮৩ সালের ফেব্রুআরিতে পুরোনো বাংলা গদ্যের কাজে কলকাতায় যান এবং অনেকের সঙ্গে এ বিষয়ে কথা বলেন ও তথ্য সংগ্রহ করেন। সমবেত প্রচেষ্টায় বাংলা সাহিত্যের একটি নতুন ইতিহাস রচনার বিষয়ে অনেক দিন ধরে ভাবনাচিন্তা করা হচ্ছিল।[৪০] আনিসুজ্জামানও অনেকদিন থেকেই ভাবছিলেন বাংলা সাহিত্যের একটি পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনার কথা, যার সূত্রপাত ঘটেছিল ১৯৬৮ সালে মুহম্মদ আবদুল হাই-এর পরিকল্পনায়। তাঁর পরিকল্পনা সম্পাদকমণ্ডলী অনুমোদন করে। তার পর ১৯৮৭ ও ২০০৮ সালে ১ম ও ২য় খণ্ড বই আকারে প্রকাশিত হয়। আনিসুজ্জামান ১৯৮৪ সালে শিক্ষায় বিশেষ অবদানের জন্য একুশে পদক পান। এ পুরস্কার নেবেন কিনা তা নিয়েও দ্বিধার মধ্যে পড়ে যান। কারণ পুরস্কার দেবেন হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের সরকার। বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক ফোনে জানান সরকার একুশে পদক দিতে চাইছেন এবং তা তিনি নেবেন কিনা। এ প্রসঙ্গে আনিসুজ্জামানের অভিমত এরকম — সরকার আমাকে একুশে পদক দিতে চাইছে, আমি তা গ্রহণ করবো কি না জানতে চান। তাঁর (মনজুরে মওলা) অনুরোধ, আমার উত্তর যেন হাঁ-সূচক হয়। আমি একদিন সময় নিলাম। একুশে পদক রাষ্ট্রীয় সম্মান — তা পেলে আমি সম্মানিত হবো। কিন্তু যে-সরকার সেটি দিতে চাইছেন, সে সরকারের ঘোরতর বিরোধী আমি। রাষ্ট্র ও সরকারের মধ্যে পার্থক্যের কথা বলা হয় বটে, কিন্তু আমাদের মতো দেশে সে পার্থক্য ক্ষীণ। তারপরও, রাষ্ট্রীয় সম্মান যে-সরকারই দেয় আমি নেবো, এমন একটা ভাবা যেতে পারে হয়তো।[৪১]

ঢাকা পর্ব:

আনিসুজ্জামান সপরিবারে তল্পিতল্পাসহ ঢাকায় স্বামীবাগে শ্বশুরবাড়িতে ওঠেন। রাষ্ট্রপতি এরশাদের শাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু হয়েছে। তিনি চট্টগ্রাম থাকতেও এমন আন্দোলন করেছেন এরশাদ যখন ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম ঘোষণা করেছিলেন। নিজে সর্বশ্রেণির নাগরিকদের একটি সভা আহ্বান করেছেন। এতে বলা ছিল — বাংলাদেশে যে-স্বৈরশাসন চলছে এবং রাষ্ট্রীয় ধর্মঘোষণা ও অন্যান্য ঘটনার মধ্য দিয়ে যেভাবে সাম্প্রদায়িকতার পুনরুত্থানের প্রচেষ্টা চলছে, তা একদিকে যেমন মুক্তিযুদ্ধের মূল চেতনাকে আঘাত করছে, অন্যদিকে তেমনি জাতির ভবিষ্যৎকে অন্ধকারের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। এর বিরুদ্ধে দৃঢ়ভাবে প্রতিরোধ ও জনমত গড়ে তোলা প্রয়োজন। এ বিষয়ে সক্রিয় উদ্যোগ গ্রহণের জন্য আমরা চট্টগ্রামের সর্বশ্রেণির নাগরিকদের একটি সভা আহ্বান করেছি।[৪২] আবার বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা আন্দোলন করছে; সরকারপন্থী ছাত্রদের সঙ্গে আন্দোলনকারী ছাত্রদের সংঘাত দেখা দিয়েছে। চারদিকে বোমা ও গুলাগুলির শব্দ। এমন অবস্থায় তিনি ক্লাস চালিয়ে যাচ্ছেন। এর মধ্যে জগন্নাথ হলের ভবন ধসে পড়েছে। ৪০ জন ছাত্র মারা যায়। দেশে রাজনৈতিক সংঘাত-সংঘর্ষ বেড়েই চলেছে। এমন পরিস্থিতিতে উপাচার্য ভবনে হামলা হয়। আনিসুজ্জামান সমবেদনা জানাতে যান। আনিসুজ্জামান তদবির করতেন না; যা তাঁর সঙ্গে যায় না তার আরেকটি উদাহরণ হলো তাঁর স্ত্রী বেবীর নিয়োগে কোনো সুপারিশ না করা।

১৯৮৭ সালে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয় এবং মুনীর চৌধুরী রচনাবলীর চতুর্থ খণ্ডের ভূমিকা লেখেন। একই সময়ে আরেকটি কাজের সঙ্গে যুক্ত হন। তা হলো পরীক্ষা সংস্কার কমিটিতে কাজ করেন। তবে এ কমিটি যা সুপারিশ করেছিল তার একটি বা দুটি বাস্তবায়ন করেছিল সরকার। রাজনৈতিক পরিবেশ খারাপ হতে থাকলে নাগরিক সমাজের পক্ষ থেকে কিছু করার উদ্যোগ নেওয়ার চিন্তা করেন আনিসুজ্জামান ও তার সমমনা লোকদের নিয়ে। এর আগে চট্টগ্রামেও এমন উদ্যোগ নিয়েছিলেন। স্বৈরশাসন থেকে মুক্ত হবার জন্য সংবিধানের পথে থেকে বিকল্প সরকার গঠনের আহ্বান জানিয়ে ৩১জন বুদ্ধিজীবী বা নাগরিক বিবৃতি দেন; যা ১৯৮৭ সালের ৩১ মার্চ সকল দৈনিক কাগজে প্রকাশিত হয়। এটি প্রকাশ হলে পক্ষে-বিপক্ষে নানা মতামত আসতে থাকে। এই বুদ্ধিজীবীদের নিয়ে সংশয়ও প্রকাশ করা হয়। একে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলেও আখ্যা করা হয়। কারণ এমন ধারা সংবিধানে তখন ছিলো না। অনেকে একে অস্পষ্ট বিবৃতি বলেও মন্তব্য করেন। তবু এটি যে মুক্তির একটি পথ ছিল তা উপলব্ধি করতে পারেন অনেকে। জনগণের মধ্যে এই বিবৃতি গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছিল। এই স্বাক্ষরদাতা গোষ্ঠী এরশাদের পতন পর্যন্ত, এমনি কি পতনের তিন বছর আট মাস পর্যন্ত সক্রিয় ছিল। ১৯৮৮ সালে স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলন আরও প্রবল হয়। শেখ হাসিনা ও খালেদা জিয়াকে

© Santiniketan Sahityapath

অন্তরীণ করা হয়। দেশব্যাপী হরতাল, বিভিন্ন জায়গায় সশস্ত্র সংঘাত হয়। অনেক রাজনীতিবিদ ও এই আন্দোলনের সঙ্গো জড়িত অনেকে আত্মগোপন করতে বাধ্য হন।

আনিসুজ্জামান ১৯৮৭ সালে আরেকটি মানবিক কাজ করেন, তা হলো মুক্তিযুদ্ধে শহীদ শিক্ষকদের পরিবারের জন্য আবাসন বরাদ্দ ছিল ১৫ বছরের জন্য, তার মেয়াদ শেষ হবে এই বছর। সার্বিক দিক বিবেচনা করে তিনি দেখলেন এ বছর তাঁদের বাড়ি ছাড়তে হলে অনেকে মহাবিপদে পড়বেন, তাই তাঁদের জন্য আরও পাঁচ বছর বরাদ্দ বাড়ানোর আবেদন করেন এবং তা সিন্ডিকেটে পাশ হয়। এ কাজে অনেকে আপত্তি তোলেন। তবু তিনি এ কাজে সফল হয়েছেন। বিভাগের জ্যেষ্ঠতা নিয়েও তাঁকে বিড়ম্বনাতে পড়তে হয়েছে। তিনি এতেও ছাড় দিয়েছেন যেন সর্বংসহা আনিসুজ্জামান।

১৯৮৮ সাল নানা ঘটনায় আনিসুজ্জামানের জীবনে একটি ঘটনাবহুল বছর। এ বছরের জুনে সংসদে সংবিধানের অষ্টম সংশোধনী গৃহীত হয়। ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম ঘোষণা করা হয়। এ ঘোষণার প্রতিবাদে পরদিনই ঢাকাসহ আরো কয়েকটি শহরে ধর্মঘট পালিত হয়। এঘটনার প্রতিবাদে আনিসুজ্জামান ও তাঁর মতো বুদ্ধিজীবীদের নিয়ে 'স্বৈরাচার ও সাম্প্রদায়িকতা প্রতিরোধ' কমিটি গঠন করেন। একাধিক সভা করে এটি প্রত্যাহারের দাবি জানান এবং এর বিরুদ্ধে হাইকোর্টে হামলাও করেন। এ কমিটি বেশ সক্রিয় ছিল। একটি গণতান্ত্রিক ও ধর্মনিরপেক্ষ বাংলাদেশ নির্মাণ এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির সমাজ গঠনের জন্য এরা অনেক সভা করেছেন এবং প্রবন্ধ সংকলন করেছেন। স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশের যে-সংবিধান রচনার সঙ্গো আনিসুজ্জামান একাত্মখাবে জড়িত ছিলেন, সে সংবিধানের এরূপ অঙ্গাহানি তাঁর পক্ষে মেনে নেওয়া সহজ ছিল না।[৪৩] সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের এক বন্ধু মনোতোষ বড়ুয়া আনিসুজ্জামানকে নিবিড় পরিবেশে বলেন — 'আমার তো মনে হয়, স্বতন্ত্র নির্বাচন ফিরিয়ে আনা ছাড়া সংখ্যালঘুদের স্বার্থরক্ষার উপায় নেই।'[৪৪] এই অপ্রত্যাশিত ও মনোবেদনার কথা শুনে গ্রন্থকার মনোতোষ বড়ুয়াকে বলেন — 'তাহলেই ধর্মনিরপেক্ষতার সম্পূর্ণ পরাজয় হবে। আমাদের নেতারা স্বতন্ত্র নির্বাচন-ব্যবস্থা বাতিল করেছিলেন অনেক আন্দোলন করে। এখন তা ফিরিয়ে আনলে স্বাধীন বাংলাদেশে পাকিস্তানকেই ফিরিয়ে আনা হবে।'[৪৫] এর প্রেক্ষিতে মানবতাবাদী আনিসুজ্জামান বলেন — 'তবে তিনি কী গভীর বেদনা ও হতাশা থেকে স্বতন্ত্র নির্বাচন ফিরিয়ে আনার কথা বলেছিলেন, তা আমি বুঝতে পেরেছিলাম।'[৪৬] রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম হলে অন্যান্য ধর্মের লোকজন বঞ্চিত হবে সে আশঙ্কা থেকেই তাদের এমন দুশ্চিন্তা। ১৯৮৯ সালে ডাকসু নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এরশাদ সরকারবিরোধী আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে এই নির্বাচন ছিল তাৎপর্যপূর্ণ। এখানে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের অসহায় অবস্থা দেখতে পান। তারপর ১৯৯০ সালে জানুআরিতে আপসোতে যোগ দিতে ইয়েমেনের রাজধানী এডেনে যান। এডেন থেকে ফেরার কয়েক মাস পর আপসোর কেন্দ্রীয় আমন্ত্রণে বাদুং সম্মেলনে যোগ দিতে কায়রোতে যান। এ সময় কাঠমুণ্ডুতে অনুষ্ঠিত 'South Asia Forum for Human Right' আন্তর্জাতিক সম্মেলনেও অংশ নেন।

১৯৯০ সালে আবার স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলন প্রবল হয় এবং সংঘাতপূর্ণ রূপ নেয়। এবং সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা শুরু হয়। সরকারবিরোধী আন্দোলন থামাতে হয়তো সরকার ইচ্ছাকৃত ভাবেই এমন পরিস্থিতি তৈরি করেন বলে মনে করেন আনিসুজ্জামান। দাঙ্গা বিরোধী মিছিল করেন আনিসুজ্জামান ও প্রগতিশীল নাগরিকগণ। স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলন তীব্র থেকে তীব্রতর হতে থাকে। আন্দোলন দমনে সরকার সান্ধ্য আইন জারি করে, তবু শেষ রক্ষা হয়নি এরশাদ সরকারের। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গুলাগুলি হয় এবং শিক্ষকদের উপরও হামলা করা হয়। এমন পরিস্থিতি বর্ণনা করেন আনিসুজ্জামান এভাবে ১৯৯০ সালে কিন্তু স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলন প্রবল হলো। ছাত্রদের ধর্মঘট ও সংঘর্ষ, চিকিৎসকদের ধর্মঘট, আইনজীবীদের প্রতিবাদ, শ্রমিক-সংঘর্ষ, পরিবহণ-ধর্মঘট, ছাত্র-পুলিশ সংঘাত, বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ, হরতাল — এসব লেগেই রইল। অক্টোবর মাসে সারাদেশে রাজপথ ও রেলপথ অবরোধের কর্মসূচি পালিত হলো।[৪৭] এমন আন্দোলন সংগ্রাম আনিসুজ্জামানের জীবনদৃষ্টি আরও প্রবল করে। তিনি নিজেও সংগ্রামের সঙ্গো জড়িত। আন্দোলন, সংগ্রাম ও সরকারের দমনপীড়ন শেষে এরশাদ বিদায় নিলেন ১৯৯০ সালের ৬ ডিসেম্বর। জনগনের মধ্যে বাধভাঙা আনন্দ। এতে মানুষের আশা প্রত্যাশা বেড়ে গেল। আনিসুজ্জামান একে তুলনা করেন স্বাধীনতালাভের আনন্দ ও প্রত্যাশার সঙ্গো। এরশাদকে নিজগৃহে আটক রাখা হয়। দুর্নীতির দায়ে গ্রেফতার করা হয়। তার দলের অনেককেই গ্রেফতার হন। ১৯৯১ সালের ২৭ ফেব্রুআরি দেশে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এ নির্বাচনে কোনো দলই নিরঙ্কুশ বিজয়ী হয়নি। ফলে মন্ত্রিসভা গঠনে বিলম্ব হয়। জামায়াতে ইসলামী বিএনপির প্রতি সমর্থন জানালে বিষয়টির সাংবিধানিক সুরাহা হয়। বিএনপি মন্ত্রিসভা গঠন করে।

© Santiniketan Sahityapath

যদিও আওয়ামী লীগ নির্বাচনে সূক্ষ্ম কারচুপির অভিযোগ করে। এরই মধ্য দিয়ে মুক্তিযুদ্ধবিরোধী জামায়াতে ইসলামী রাজনীতির তিনজন আইনসভায় জায়গা করে নেয়।[৪৮] সংবিধানে যেখানে ধর্মের নামে রাজনীতির সুযোগ বন্ধ করেছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। দীর্ঘ বিদেশ ভ্রমণ শেষে দেশের রাজনৈতিক হালচালের খবর দিলেন। দেশে রাজনৈতিক অঙ্গনে অস্থিরতা বেড়েই চলেছে। স্বৈরতান্ত্রিক সরকারের অবসান হলেও গণতন্ত্রের অনুশীলন তেমন হচ্ছে না। এ অভাবে রাজনৈতিক বিরোধ হরতাল অবরোধ বেড়েই চলছে। সরকারের দমননীতি হিসেবে পুলিশের সঙ্গো দলীয় কর্মীদের দাওয়া পাল্টা দাওয়া চলছে। গণতন্ত্র তার আপন গতি পাচ্ছে না। এ দিকে ১৯৯৩ সাল থেকে বিরোধী দল হিসেবে আওয়ামী লীগ তত্ত্বাবধায়ক সরকার সাংবিধানিক ভাবে প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করে আসছে। এ প্রসঙ্গো ১৯৯৬ সালের ঘটনা সম্পর্কে আনিসুজ্জামান বিপুলা পৃথিবীতে বলেন — তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবিতে বিরোধী দলের আন্দোলন প্রবল হয়ে উঠেছে। একাদিক্রমে ৩৬ ঘণ্টা কী তারও বেশি সময় ধরে হরতাল চলছে — জনজীবন বিপর্যস্ত। সাধারণ নির্বাচন হওয়ার কথা ফেব্রুআরি মাসে। জানুআরি মাসেই প্রার্থিতা প্রত্যাহার করে নিয়েছেন বিরোধী দলীয় প্রার্থীরা। মাঠে রয়েছেনন বিএনপির মনোনীত প্রার্থী, বিএনপির বিদ্রোহী প্রার্থী, গুরুত্বহীন রাজনৈতিক দলের কিছু প্রার্থী, কয়েকজন স্বতন্ত্র প্রার্থী। প্রধানমন্ত্রী যেখানে যাচ্ছেন, সেখানেই বিক্ষোভ হচ্ছে, পুলিশের সঙ্গো বিক্ষোভকারীদের সংঘাত ঘটছে।[৪৯]

১৯৯৬ সালের অগস্টে রাষ্ট্রদ্রোহিতার মামলা থেকে মুক্ত হবার পর রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে আলোচনা করতে জার্মানি যান এবং 'টেগোর অ্যান্ড দি ওয়েস্ট' শিরোনামে প্রবন্ধ পাঠ করেন। এদিকে শেখ হাসিনার সরকার ১৯৯৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে 'বাংলাদেশ বেতার ও বাংলাদেশ টেলিভিশনে সৃজনশীলতা, গতিময়তা, জবাবদিহিতা ও শৃঙ্খলা আনয়ন এবং এ দুটি প্রতিষ্ঠানের অধিকতর স্বায়ত্তশাসন প্রদানের নীতিমালা-সংক্রান্ত বিষয়ে সুপারিশ প্রণয়নের উদ্দেশ্যে' সরকার একটি কমিশন গঠন করে।[৫০] এর অন্যতম সদস্য করা হয় আনিসুজ্জামানকে। এই কমিশন স্বাধীনভাবে কাজ করার মানসে বিভিন্ন উদ্যোগ নেয়। পৃথিবীর অন্যান্য দেশে কীভাবে প্রচারমাধ্যম স্বায়ত্তশাসন বজায় রেখে কাজ করছে তা দেখার জন্য বিভিন্ন দেশ ভ্রমণের সিদ্ধান্ত নেয়। তিনটি দলে বিভক্ত হয়ে তা সরেজমিনে দেখতে যায়। আনিসুজ্জামানের দল যায় ফিলিপাইনে। তাঁদের পর্যবেক্ষণ শেষে রিপোর্ট জমা দেন। এ রিপোর্টে বলা হয় — রিপোর্টে আমরা একটি স্বাধীন সম্প্রচার কমিশন-প্রতিষ্ঠার কথা বলেছিলাম। এর চেয়ারম্যান ও সদস্যরা রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হবেন। এই কমিশন জবাবদিহি করবে তথ্যসম্পর্কিত সংসদীয় কমিটির মাধ্যমে সংসদের কাছে। মন্ত্রণালয়ের কোনো কর্তৃত্ব এর ওপর থাকবে না। বেতার ও টেলিভিশন স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানরূপে এর তত্ত্বাবধানে কাজ করবে। সেখানে মন্ত্রণালয়ের হস্তক্ষেপ থাকবে না।[৫১] সরকার প্রধান হিসেবে শেখ হাসিনাও প্রচার-মাধ্যমের স্বায়ত্তশাসন চেয়েছিলেন। কিন্তু মন্ত্রণালয়ের দ্বন্দ্বে তা আর আলোর মুখ দেখেনি।

১৯৯৬ সালের ডিসেম্বরে বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধের রজত জয়ন্তী উপলক্ষে কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্তর্জাতিক আলোচনা সভায় যোগ দিতে যান এবং প্রবন্ধ পাঠ করেন; যেটি পরবর্তীতে 'Bangladesh-Promise and Performance' গ্রন্থে স্থান পায়। তিনি কলাম্বিয়া থেকে ড. ক্যারলের আমন্ত্রণে সিয়াটলে যান এবং ইউনিভার্সিটি অফ ওয়াশিংটনে 'Identity and Politics in Bangladesh' শিরোনামে প্রবন্ধ পড়েন। ১৯৯৭ সালে আবার কলকাতায় যান নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর জন্মশতবার্ষিক অনুষ্ঠানে। আনিসুজ্জামান মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর প্রতিষ্ঠার সঙ্গো জড়িত হন।

১৯৯৭ সালে নজরুল ইন্সটিটিউটের সভাপতি হন। এর সঙ্গো যুক্ত হয়ে নজরুল জন্মশতবর্ষ পালনের উদ্যোগ নেন। যদিও বাংলা একাডেমির সঙ্গো যুক্ত থেকে নজরুল রচনাবলী প্রকাশ করতে পেরেছিলেন। ১৯৯৮ সালে আবার এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকার এশিয়ান সংস্করণের সম্পাদক হবার সুযোগ পান এবং সেটা কাজে লাগান এবার। ১৯৯৯ সালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গো কলকাতায় বইমেলা উদ্বোধন করতে যান আনিসুজ্জামান। এই সময় দেশের নির্বাচন পরিস্থিতিতে প্রধান নির্বাচন কমিশনার নিয়োগের ব্যাপারে পরামর্শ দেন; যাতে দেশে আবার খারাপ পরিস্থিতি তৈরি না হয়। এ পরামর্শ সম্পর্কে আনিসুজ্জামান বলেন — শেখ হাসিনাকে আমি বললাম, 'তুমি বিরোধী দলের নেত্রীকে আমন্ত্রণ জানাও পরবর্তী প্রধান নির্বাচন কমিশনার নিয়োগের প্রশ্নে আলাপ করতে।' হাসিনা বললো, 'উনি আসবেন না।' আমি বললাম, 'সেক্ষেত্রে তুমি বলতে পারবে, এ-বিষয়ে একমত হওয়ার চেষ্টা তুমি করেছিলে। যদি উনি আসেন এবং তোমরা একমত হতে পারো, তাহলে সকলেই স্বস্তি পাবে।[৫২] আনিসুজ্জামান সকলের শান্তি ও স্বস্তির কথা চিন্তা করেছন, যা তাঁর জীবনদৃষ্টিরই বহিঃপ্রকাশ।

© Santiniketan Sahityapath

২০০০ সালে শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়ে জাহানারা ইমাম নামে হলের নামকরণ নিয়ে চলমান পরিস্থিতিতে হুমায়ূন আহমেদ অনশনের চিন্তা করলে তিনিও তাতে যোগ দেন। মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের সকল আন্দোলনে তিনি যুক্ত থাকতেন, এটা তারই প্রমাণ। তিনি অসুস্থ শরীর নিয়েও এসব আন্দোলন-সংগ্রামে শরিক হতেন। তিনি বাংলা বিভাগের সভাপতি পদে নিয়োগ পেলেও তাতে যোগ দেননি। শুধু তাঁর নিয়োগের সময় যারা বিরোধিতা করেছিল তাঁদের প্রতি প্রতিবাদ স্বরূপ।

২০০১ সালে জ্ঞানতাপস আব্দুর রাজ্জাক ফাউন্ডেশনের সঙ্গে যুক্ত হন আনিসুজ্জামান। কারণ তিনি তাঁর সহকর্মী এবং হিতাকাঙ্ক্ষী ছিলেন। তাঁকে বলতেন আনিসুজ্জামান পড়াশোনা ছাড়া আর সবকিছুই করেন। এই বছর তিনি রাশিয়াতে যান। ২০০২ সালের ৩০ জানুআরি বাংলা একাডেমির বইমেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের দাওয়াত পত্র এলো। এতে আনিসুজ্জামানকে সভাপতি না উল্লেখ করায় তিনি এই পদ থেকে ৩১ জানুআরি পদত্যাগ করেন। এই ঘটনার প্রতিবাদে অনেকে ওই অনুষ্ঠানে যাননি। কিন্তু আনিসুজ্জামান গিয়েছিলেন সাধারণ সদস্য হয়ে। যাঁরা রাগ করেছিলেন তাঁদের বুঝিয়েছিলেন এই বলে — একুশের বইমেলা জাতীয় অনুষ্ঠান আর ঘটনা ব্যক্তিগত; আর আমি উপস্থিত ছিলাম বাংলা একাডেমির একজন সাধারণ সদস্য হিসেবে, সভাপতি আছি কিনা তা গুরুত্বপূর্ণ নয়।[৫৩] এর মাধ্যমে তাঁর জীবনদৃষ্টির মধ্যে যে আত্মমর্যাদাবোধ ছিল তা পরিমাপ করা যায় এবং ব্যক্তির চেয়ে প্রতিষ্ঠান বড়ো তাই প্রমাণ করেছেন। নিজের আত্মকষ্টের জন্য প্রতিষ্ঠানকে ছোটো করেন নি। আনিসুজ্জামানের এমন কথায় যেন বঙ্গবন্ধুর কথাই মনে পড়ে তিনিও বলেছিলেন, মানুষকে খেতে দিতে পারি না, পরতে দিতে পারি না, একটু যদি দেখাও না দিই তাহলে আমার কী থাকলো। আনিসুজ্জামানও যেন সেই উক্তির পুনরাবৃত্তি করলেন। জনগণের প্রতি দায় থেকেই তিনি মানুষের জন্য ব্যস্ত থাকতেন।

অন্যদিকে যে-কোনো মানুষের জীবনদৃষ্টি তৈরির ক্ষেত্রে বাস্তবিক অর্থে দুইটি বিষয় প্রভাব রাখে; প্রথমটি হলো তার জীনগত বৈশিষ্ট্য অপরটি হলো সামাজিক পরিবেশ। জীনগত বংশ পরম্পরায় ক্রিয়াশীল থাকে, এতে মানুষের কোনো নিয়ন্ত্রণ থাকে না। কিন্তু মানুষ হয়ে ওঠার জন্য স্থান-কাল-পাত্র, সমাজ-সংস্কৃতি এবং পারিপার্শ্বিক পরিবেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এ ক্ষেত্রে মানুষের বেছে নেওয়ার সুযোগ থাকে। বলা যেতে পারে, জীবনদৃষ্টি বিকাশের ক্ষেত্রে স্বনির্বাচনে গ্রহণ বর্জনের জ্ঞান দ্বারা নিজেকে সমৃদ্ধ করতে পারে, নিজেকে করতে পারে ঋদ্ধ। অথবা বিপরীত ভাবে নিজেকে ঠেলে দিতে পারে অপরাধের অন্ধকার জগতে। স্বল্প কথায় বললে, ব্যক্তি নিতে পারে যোদ্ধার ভূমিকা, যেখানে প্রতিকূল পরিবেশের সঙ্গে যুদ্ধ করে নিজেকে পারে গড়ে তুলতে অথবা পারে প্রতিবেশের বৈরিতায় আত্মসমর্পণের মাধ্যমে হারিয়ে যেতে।[৫৪] আনিসুজ্জামান প্রতিকূল পরিবেশের সঙ্গে যুদ্ধ করে করে নিজের জীবনদৃষ্টিতে আস্থা রেখেছেন এবং নিজেকে মর্যাদাশীল জায়গায় আসীন করতে পেরেছেন। আনিসুজ্জামানের জীবনদৃষ্টির ক্ষেত্রেও উপর্যুক্ত দুটি বিষয় (জীনগত বৈশিষ্ট্য ও পরিবেশগত প্রভাব) বিবেচনা করলে দেখতে পাওয়া যায় জিনগত বৈশিষ্ট্যের ধারায় তিনি তাঁর দাদার দ্বারা বেশি প্রভাবিত হয়েছেন। সাহিত্য সাধনা, কোলাহল বর্জন, স্বল্পভাষী ও প্রত্যয়ী এ বৈশিষ্ট্যগুলি আনিসুজ্জামানের ভিতর পাওয়া যায় তা তাঁর দাদার নিকট থেকে জিনগত উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছেন। সামাজিক পারিপার্শ্বিক পরিবেশে তিনি একজন সাহসী যোদ্ধা। তিনি সৎ, নির্ভীক, মুক্তবুদ্ধিচর্চাকারী, ন্যায়ের পক্ষে, গণতন্ত্রের পক্ষে, মানবতার পক্ষে এবং সাম্প্রদায়িকতার বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছেন। সামাজিক-সাংস্কৃতিক ও ইতিহাসের প্রতি সর্বদা দায়বদ্ধ থেকেছেন। মানবতাবাদ, সততা, নিষ্ঠা, প্রবল আত্মসম্মানবোধ দ্বারা চালিত হয়েছে তাঁর জীবন-সত্তা। নীতি ও সম্মানের প্রশ্নে কখনো আপোস করেন নি, পরিণামে অনেক দুর্ভোগ সহ্য করতে হয়েছে। তবু তিনি সত্যের পথে থেকেছেন, দেশ তাঁকে বঞ্চিত করেনি। রাষ্ট্রীয় নানা গুরুত্বপূর্ণ পদে তাঁকে স্থান করে দিয়েছে। তাছাড়াও প্রবল দেশপ্রেম লালন করেছেন হৃদয়ে, এজন্য বলতে পেরেছেন আমার কোনো খেদ নেই। আমি এ বাংলায় জন্মগ্রহণ করিনি ঠিক, তবু শেষ আশ্রয় যেন এ দেশের মাটিতে হয়।

দেশ-কাল, সমাজ, জীবন ও রাজনৈতিক পটভূমি অর্থাৎ সমকালীন পরিপ্রেক্ষিত আলোচনার আলোকে মোটা দাগে যে জিনিসগুলি তাঁর জীবনদৃষ্টিতে প্রতিভাত হয়েছে সেগুলি নিম্নরূপ:

ক) বাঙালি মুসলমানের মানসজগৎ সন্ধান ও সাহিত্যচর্চা

খ) বাঙালির আত্মপরিচয় ও স্বরূপ

গ) স্বদেশ ও স্বজাত্যবোধ

ঘ) ধর্মনিরপেক্ষতা ও অসাম্প্রদায়িক চেতনা

© Santiniketan Sahityapath

ঙ) ইহজাগতিকতা

চ) গণতন্ত্রমনা

ছ) প্রগতিশীল ও আধুনিক

জ) উদার মানবিকতা

ঝ) মুক্তবুদ্ধি ও মাঙ্গালিক চেতনা

ঞ) সৎ ও নৈতিকতা

ট) সাহিত্য, সমাজ ও রাজনীতিকে একসুতোয় গাঁথা

আনিসুজ্জামানের জীবনদৃষ্টি খোঁজার জন্য বেশি কিছু প্রয়োজন নেই। তাঁর সন্তানদের নামকরণের মধ্যেই তা পাওয়া যায়। দুই মেয়ের নাম রুচি ও শুচি। এই রুচিতা ও শুচিতাই ছিল তাঁর জীবনাদর্শ তাই বোধ হয় কন্যাদের নাম দিয়ে ছিলেন 'রুচি ও শুচি'। আর জীবন তৃষ্ণায় তিনি ছিলেন আনন্দ পিয়াসী (সেই জন্যেই কি পুত্রের নাম আনন্দ)।[৫৫]

বাঙালি মুসলমানের মানসজগৎ সন্ধান ও সাহিত্যচর্চা বিষয়টি তাঁর প্রথম গবেষণাগ্রন্থ 'মুসলিম-মানস ও বাংলা সাহিত্য', 'মুসলিম বাংলার সাময়িকপত্র', 'স্বরূপের সন্ধানে', 'উনিশ শতকের বাঙালি মুসলমান ও সমাজ' প্রবন্ধে, 'বঙ্গাভঙ্গ ও মুসলমান সমাজ' প্রবন্ধে পাওয়া যায়। বাঙালির আত্মপরিচয় ও স্বরূপ বিষয়টি গবেষণাগ্রন্থ মুসলিম-মানস ও বাংলা সাহিত্য, স্বরূপের সন্ধানে, বাঙালির আত্মপরিচয়, বাঙালি সংস্কৃতি, বাংলাদেশের ভাষা-পরিস্থিতি, 'বাংলাদেশ, বাঙালি ও বাংলাদেশি', 'বাংলাদেশের ধর্ম, রাজনীতি ও রাষ্ট্র' প্রভৃতি প্রবন্ধে পাওয়া যায়। স্বদেশ ও স্বজাত্যবোধ সম্পর্কে 'মুক্তিযুদ্ধ এবং তারপর, আমার চোখে, পূর্বগামী'গ্রন্থে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা প্রবন্ধে এ বিষয়টি প্রকাশিত হয়েছে। ধর্মনিরপেক্ষতা ও অসাম্প্রদায়িক চেতনা বিষয়টি ইহজাগতিকতা, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, সাম্প্রদায়িকতার প্রত্যাবর্তন, ধর্মনিরপেক্ষতা, 'বাংলাদেশের ধর্ম, রাজনীতি ও রাষ্ট্র', সাম্প্রদায়িকতার ভাবাদর্শ, সাংস্কৃতিক বহুত্ব প্রবন্ধে পাওয়া যায়। ইহজাগতিকতা বিষয়টি তার ধর্মনিরপেক্ষ চিন্তাধারার সঙ্গো জড়িত। এটি তাঁর ইহজাগতিকতা প্রবন্ধে বেশি পরিস্ফুট হয়েছে। আর উদারনৈতিকতা হলো সাহিত্য-সমাজ-সংস্কৃতি-ধর্ম-রাষ্ট্র সর্বত্রই ব্যক্তিকে গুরুত্ব দেওয়া। তাঁর রচনায় এই বিষয়টি ব্যাপকমাত্রায় আছে। আর নীতি নৈতিকতা সম্পর্কে 'নীতিকথার পরের কথা' প্রবন্ধে বলেছেন, সময়ের ব্যবধানে ও ব্যক্তির ভেদে নীতিবোধের পার্থক্য হয়। সমাজেদের ভেদেও হয়।[৫৬] সমাজ তার ভালো-মন্দ নির্ধারণ করে থাকে এবং নিজেদেরটা সর্বোত্তম মনে করে থাকে। এর ভিত্তিতে আনিসুজ্জামানের মধ্যে মায়ের কাছ থেকে পাওয়া সততা ও নৈতিকতার বিষয়টি গড়ে উঠে। তবে সমাজের সঙ্গো ব্যক্তির মূল্যবোধের বিরোধ মাঝে মাঝে দেখা দেয়। নৈতিকতা সম্পর্কে আনিসুজ্জামান বলেন, নৈতিকতা সমাজ ও রাষ্ট্রের ভিত্তি। নৈতিকতা যে-শৃঙ্খলা বিধান করে, তা ব্যতিরেকে সমাজ ও রাষ্ট্র চলতে পারে না।[৫৭] এমনকি রাষ্ট্রের বিরুদ্ধাচরণ করাও ব্যক্তির নৈতিক অধিকার বলে আনিসুজ্জামান মনে করেন। তেমনি নৈতিকতার জন্য রাষ্ট্রের বিরুদ্ধেও অবস্থান নিয়েছেন, রাষ্ট্রদ্রোহিতার মামলাতেও পড়েছেন।

মানুষের অভিজ্ঞতা ও চিন্তাভাবনার পরিবর্তনের মাধ্যমে নৈতিকতাবোধে পরিবর্তন আসতে পারে কিন্তু আনিসুজ্জামানের ক্ষেত্রে সেই নৈতিকতা ছিল অটল। তাই তো তিনি সমাজের ভিত্তি মজবুত করার জন্য ন্যায় ও সত্য প্রতিষ্ঠার উপর জোর দিয়েছেন। বাকি বিষয়গুলি আনিসুজ্জামানের রাষ্ট্রচিন্তা, সমাজচিন্তা, বঙ্কিমচন্দ্রের হিতবাদ, ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্বকেন্দ্রিক রচনার মধ্যে আলোচনা প্রসঙ্গো এসেছে। আশা রাখা যায়, আনিসুজ্জামানের ইহজাগতিকতার মশাল বাঙালির হৃদয়ের অন্ধকার দূরীভূত করে জাতিকে নতুন পথের দিশা দেবে। আনিসুজ্জামানের মধ্যে পাওয়া যায় আশাবাদী জীবনবোধের সমন্বয়। তাঁর প্রতিটি রচনাই স্বয়ংসম্পূর্ণ। ফলে আলোচনা বা মূল্যায়নে শিথিলতা ও আরোপিত সিদ্ধান্ত নেই। নিপুণ তথ্যবিন্যাস এবং বলিষ্ঠ বিবৃতির মাধ্যমে অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছে যান। এ সম্ভব হয়েছে, তাঁর বুদ্ধির দীপ্তি ও মননশীলতা এবং প্রজ্ঞাদীপ্ত মননমুখরতার জন্যে। তিনি ছিলেন বাংলার জীবন্ত জ্ঞানকোষ। বাঙালি জাতির জাতীয়তাবোধের দলিল রচনাকারী হিসাবে স্মরণীয় হয়ে থাকবেন বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রের বুকে। তাঁর কারণও আছে দেশে বিদেশে যেখানেই তিনি অবস্থান করেছেন বাঙালি হয়ে থেকেছেন। আশা করি তাঁর গভীর জীবনদর্শন বোধ বাঙালির সাহসী চেতনায় দীপ্ত থাকবে। তাঁর মধ্যে যেমন অনুসন্ধানী বুদ্ধি দীপ্ততা ছিল তা যদি বাঙালি তরুণ প্রজন্মের মাঝে সৃষ্টি হয়, তারা কখনো পথ হারাবে না। আনিসুজ্জামানের মননশীল শিল্পগুলি বাংলাদেশে যদি ঠিকভাবে চর্চিত তখন আগামীর বাংলাদেশ হয়ে উঠবে সত্য, সুন্দর, সামষ্টিক

© Santiniketan Sahityapath

কল্যাণের ও ধর্মনিরপেক্ষতার। মহাকাল সব মুছে দেয়, ভুলিয়ে দেয় অতীত। আশা করা যায় আনিসুজ্জামান তাঁর জীবন ও কর্মের কারণে বাঙালির মাঝে তথা বাংলা সাহিত্যে অমোচ্য হয়ে থাকবেন।

তথ্য সূত্র:

১। 'আনিসুজ্জামান স্মরণ', হাসান আজিজুল হক, ঢাকা, বেঙ্গাল পাবলিকেশনস, ২০২১, পৃ. ৪২
২। 'আনিসুজ্জামান স্মরণ', বিশ্বজিৎ ঘোষ, ওই, পৃ. ২৯৯
৩। ওই, মোহাম্মদ আবদুল মালেক, পৃ. ৫৭
৪। 'সঠিক জীবনদৃষ্টি বদলে দেবে সবকিছু', একুশে টেলিভিশন, অনলাইন, ঢাকা, ১৭ মার্চ, ২০১৮
৫। 'আনিসুজ্জামান জীবন ও কর্ম', মোহাম্মদ আবদুল মালেক, কক্সবাজার, কক্সবাজার সাহিত্য একাডেমি, ২০১১, পৃ. ১৩
৬। 'শিল্প সংস্কৃতি ও সমাজ', বিনয় ঘোষ, কলকাতা, অরুণা প্রকাশনা, ১৯৮০, পৃ. ৩৩
৭। 'সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ জীবনদর্শন ও সাহিত্যকর্ম', জীনাত ইমতিয়াজ আলী, (দ্বি. স; ঢাকা: নবযুগ প্রকাশনী, ২০০৬) পৃ. ১৩
৮। 'আনিসুজ্জামান', এম আবদুল আলীম, (ঢাকা: স্টুডেন্ট ওয়েজ, ২০২১) পৃ. ২২
৯। এম আবদুল আলীম, ওই, পৃ. ১৫
১০। 'কাল নিরবধি', আনিসুজ্জামান, (ঢাকা: সাহিত্য প্রকাশ, চ. মু; ২০১৯), পৃ. ৪৬-৫৩
১১। ওই, পৃ. ৮৯
১২। 'আনিসুজ্জামান স্মরণ', অংশুমান ভৌমিক, ওই, পৃ. ৩৪৪
১৩। ওই, পৃ. ১০৯
১৪। ওই, পৃ. ১১৫
১৫। 'আনিসুজ্জামান জীবন কথা', সুব্রত বড়ুয়া, (ঢাকা: অনুপম প্রকাশনী, ২০২২) পৃ. ১৪
১৬। 'আনিসুজ্জামান সংবর্ধনা স্মারক,' আহমদ কবির, ওই, পৃ. ১০৮
১৭। ওই, সনৎকুমার সাহা, পৃ. ৮৭
১৮। 'আনিসুজ্জামান', এম আবদুল আলীম, ওই, পৃ. ৫৮
১৯। ওই, পৃ. ২২৭
২০। ওই, পৃ. ২৩৪
২১। 'আনিসুজ্জামান সম্মাননা গ্রন্থ', আবুল হাসনাত, ওই, পৃ. ৫৫
২২। 'আনিসুজ্জামান', এম আবদুল আলীম, ওই, পৃ. ৭৮
২৩। 'কাল নিরবধি', আনিসুজ্জামান, ওই, পৃ. ৪৬৯
২৪। ওই, পৃ. ৪৯০
২৫। 'আমার একাত্তর', আনিসুজ্জামান, (ন. মু, ঢাকা: সাহিত্য প্রকাশ, ২০২১) পৃ. ৩৫
২৬। ওই, পৃ. ৩৭
২৭। ওই, পৃ. ৫০
২৮। ওই, পৃ. ৫৩
২৯। ওই, পৃ. ৭৩
৩০। ওই, পৃ. ৮১
৩১। ওই, পৃ. ১০৬
৩২। ওই, পৃ. ১৪৯
৩৩। ওই, পৃ. ১৮৬
৩৪। 'আমার বিপুলা পৃথিবী', সিদ্দিকা জামান, (ঢাকা: অন্য প্রকাশ, ২০২১) পৃ. ২৯
৩৫। 'আমার একাত্তর', আনিসুজ্জামান, ওই, পৃ. ১৯১
৩৬। https://www.shed.gov.bd/site/page/9/ কুদরত-ই-খুদা-শিক্ষা-কমিশন-১৯৭২
৩৭। 'বিপুলা পৃথিবী', আনিসুজ্জামান, ওই, পৃ. ২০৯

৩৮ । ওই, পৃ. ২১০

৩৯ । ওই, পৃ. ৩৩০

৪০ । 'আনিসুজ্জামান ও অন্যান্য', বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১মখণ্ড; ২০১৯) নিবেদন অংশ

৪১ । 'বিপুলা পৃথিবী', আনিসুজ্জামান, ওই, পৃ. ৩৫৩

৪২ । 'আনিসুজ্জামান সম্মাননা গ্রন্থ', ভূঁইয়া ইকবাল, ওই, পৃ. ৬৫

৪৩ । সুব্রত বড়ুয়া, ওই, পৃ. ১১২

৪৪ । 'বিপুলা পৃথিবী,' আনিসুজ্জামান, ওই, পৃ. ৪০২

৪৫ । ওই, পৃ. ৪০২-০৩

৪৬ । ওই, পৃ. ৪০৩

৪৭ । ওই, পৃ. ৪১৬

৪৮ । ওই, পৃ. ৪২৩

৪৯ । ওই, পৃ. ৪৭৪

৫০ । ওই, পৃ. ৪৮৪

৫১ । ওই, পৃ. ৪৮৮

৫২ । ওই, পৃ. ৫১৪

৫৩ । সিদ্দিকা জামান, ওই, পৃ. ৯৬

৫৪ । 'আমার বিপুলা পৃথিবী', মাহবুব বোরহান, আবদুল হক: জীবন ও সাহিত্য, (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ২০০৮) পৃ. ৩৫

৫৫ ।' আনিসুজ্জামান সংবর্ধনা স্মারক', মাহবুবুল হক, ওই, পৃ. ৬২

৫৬ । 'শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ' আনিসুজ্জামান, (ঢাকা: কথা প্রকাশ, চ, মু, ২০২১) পৃ. ৪১

৫৭ । ওই, পৃ. ৪৭

Prantik Gabeshana Patrika

© Santiniketan Sahityapath